মুমিন ও মুনাফিক

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

দাওরা ও ইফ্‌তা ঃ জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস, জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব ঃ রাজারদেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা

MAKTABATUL ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরয

মুমিন ও মুনাফিক। দু'টি ভিন্ন পথের দুই পথিক। একজনের পথের শেষ ঠিকানা হলো, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও চীরসুখের আবাসস্থল বেহেশ্ত। অপরজনের পথের শেষ পরিণতি হলো, আল্লাহ্র গযব ও দোযখের ভয়াবহ শাস্তি।

একজন খাঁটি মুমিন হিসেবে, আমার আক্বীদা-বিশ্বাস কেমন হওয়া দরকার, কি আমার করণীয়, কি বর্জনীয় তাও আমি জানিনা এবং জানার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি না। যার দরুন মুখে আমি নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিয়ে মুমিনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকি। কিন্তু আমার অজান্তেই আমি মুনাফিকসুলভ অসংখ্য কাজ করে থাকি। অথচ সে কাজগুলো একজন মুসলমান হিসেবে আমার জন্য কোন অবস্থাতেই শোভনীয় নয়। বিশেষ করে ঈমান ও আক্বীদার ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর অসংখ্য রচনায় এ ব্যাপারে বার বার সতর্ক করেছেন। ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর রচিত অমর গ্রন্থত্রয় 'তা'লীমুদ্দ্বীন' 'হায়াতুল মুসলেমীন' ও 'বেহেশতী জেওরে' ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় রচনা করে মুসলমানদেরকে ঈমান-আক্বীদা সহীহ্ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদের এবারের আয়োজন 'মুমিন ও মুনাফিক' গ্রন্থের আক্বীদা অধ্যায় তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেহেশ্তী জেওর' থেকে নেওয়া।

এ যুগের স্বনাম ধন্য আলিম, যিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে, আধুনিক মাসয়ালা মাসায়িল সম্পর্কে

গবেষণা কর্মের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কিরামের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা কুড়িয়েছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায, পাকিস্তানের জনাব জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী সাহেব। তিনি প্রতি শুক্রবার আসরের নামাযের পর গুলশান ইকবালস্থ বাইতুল মুকাররাম জামে মসজিদে, সর্বস্তরের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইসলাহী বয়ান করে থাকেন। তাঁর বয়ান মূলতঃ আল্লামা নববীর (রহঃ) বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ 'রিয়াযুস সালেহীন' এর দরসকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। আমাদের বর্তমান গ্রন্থ 'মুমিন ও মুনাফিক' এর মুনাফিক সম্পর্কিত আলোচনা তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠতম বয়ানের বাংলা অনুবাদ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা ও ভাষাজ্ঞানজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি হেতু প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রইলো।

এ মহতি কাজে বিভিন্নভাবে আমাকে যারা আন্তরিক সাহায্য করেছেন। তারা আখিরাতে এর পরিপূর্ণ বদলা অবশ্যই পাবেন।

মূল লিখক, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী (মুঃআঃ)এর ইখলাস ও আমলের বদৌলতে এ বইয়ের পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে নাজাতের উসীলা বানাবেন বলে আশা রাখি।

তারিখ ঃ
২রা রবিউল আউয়াল ১৪১৭ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান
জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া
ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০।

সূচীপত্র

মুমিনের পরিচয়

হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রহঃ)

মুমিনের পরিচয়

মুমিন ঈমানদার ব্যক্তিকে বলা হয়। ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান এবং গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। শরী'অতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া কোন সংবাদ কেবলমাত্র তাঁর উপর বিশ্বাস বশতঃ মেনে নেয়াকে।

গায়ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সব বস্তু যা বহ্যিকভাবে মানবকুলেব জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে গায়ব শব্দ দ্বারা ঐ সকল বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বীয় বুদ্ধি বলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্বা, সিফাত বা গুনাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং তা সংগঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশ্‌তাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের (আঃ) বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

(মা'আরেফুল কুরআন ১৩ পৃঃ)

এ বিষয়ের পরিপুর্ণ আলোচনা আমাদের এ বইয়ের 'আক্বীদার কথা, অধ্যায়ে করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌পাক প্রকৃত মুমিনের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। এ সকল আয়াতের মধ্য হতে কোন কোন আয়াতে মুমিনের জন্য দোযখ থেকে মুক্তি ও বেহেশ্‌তের ওয়াদা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারাকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামিয়াবী বলা হয়েছে। ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কিত বিষয়াবলী ভালমত জেনে নিয়ে ঈমান ও আমল দুরস্ত করতঃ পরকালের কামিয়াবীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই প্রকৃত মুমিনের কাজ। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে খাঁটি মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আক্বীদার কথা

কোন বিষয় মনে-প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আক্বীদা বলে। শরী'অত যে বিষয়কে যেমন বর্ণনা করেছে তা ঠিক তেমনই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যাবে না, এরই নাম আক্বীদা।

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করে, সর্বদা নেক কাজ করে, তাকে মুমিন বলা হয়। মুমিনের জন্য আল্লাহ্‌পাক বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিয়েছেন। (সংকলক)

আল্লাহ্‌পাক সম্পর্কে আক্বীদা

১। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, প্রথমে তা কিছুই ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা পরে এ সকল সৃষ্টি করেছেন।

২। আল্লাহ এক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী বা মোহতাজ[১] নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর স্ত্রী নেই। তাঁর মোকাবেল[২] কেউ নেই।

৩। তিনি অনাদি এবং অনন্ত, সকলের পূর্ব হতে আছেন, তাঁর শেষ নেই।

৪। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ হতে পারে না। তিনি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সকল হতে পৃথক।

৫। তিনি জীবিত আছেন। সব বিষয়ের উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। সৃষ্টি জগতে তাঁর অবিদিত কিছুই নেই। তিনি সবকিছুই দেখেন, সবকিছুই শুনেন। তিনি কথা বলেন; কিন্তু তাঁর কথা আমাদের

---

১. অর্থাৎ, তাঁর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

২. অর্থাৎ, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই যে তাঁর মোকাবিলা করতে পারে।

কথার মত নয়। তাঁর যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন, কেউ তাতে কোনরূপ বাধা দিতে পারে না।

৬। একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অর্থাৎ, অন্য কারও বন্দেগী করা যায় না। তাঁর কোনই শরীক নেই। তিনি মানুষের উপর বড়ই দয়াশীল। তিনি বাদশাহ্। তাঁর মধ্যে কোনই আয়েব (দোষ-ত্রুটি) নেই। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি ও আয়েব-শেকায়েৎ হতে একেবারে পবিত্র। তিনি মানুষকে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে থাকেন। তিনিই প্রকৃত সম্মানী। তিনিই প্রকৃত বড়। তিনি সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউই সৃষ্টি করেনি। তিনিই মানুষের সকল গুনাহ্ মাফ করেন। তিনি জবরদস্ত ও পরাক্রমশালী, বড়ই দাতা। তিনিই সকলকে রুজি দেন এবং আহার দান করেন। তিনিই যার জন্য ইচ্ছে করেন রুজি কম করে দেন, আবার যার জন্য ইচ্ছে করেন রুজি বৃদ্ধি করে দেন। তিনি আপন ইচ্ছা অনুযায়ী কারো মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, আবার কারো মান-মর্যাদা হ্রাস করে দেন। মান-সম্মান হ্রাস ও বৃদ্ধির অধিকারী তিনিই। অবমাননা, অসম্মান করার মালিকও তিনিই। তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। যে তাঁর সামান্য ইবাদতও করে, তিনি তার বড়ই ক্বদর করেন, অর্থাৎ, ছওয়াব দেন। তিনি দু'আ কবূল করেন। তাঁর ভান্ডার অফুরন্ত। তাঁর আধিপত্য সকলের উপর; তাঁর উপর কারও আধিপত্য নেই। তাঁর হুকুম সকলেই মানতে বাধ্য; তাঁর উপর কারও হুকুম চলে না। তিনি যা কিছু করেন সকল কাজেই হিক্মত থাকে, তাঁর কোন কাজই হিক্মত ছাড়া হয় না। তাঁর সব কাজই ভাল। তাঁর কোন কাজে দোষের লেশ মাত্রও থাকে না। তিনি জীবনদাতা এবং তিনিই মৃত্যুদাতা। ছিফত (গুণাবলী) এবং নিদর্শন দ্বারা সকলেই তাঁকে জানে; কিন্তু তাঁর জাতের বারিকী বা সুক্ষ্মতত্ত্ব কেউই বুঝতে পারে না।

তিনি গোনাহ্গারের তাওবা[1] কবূল করে থাকেন। যারা শাস্তির যোগ্য তাদেরকে শাস্তি দেন। তিনিই হিদায়াত করেন, অর্থাৎ, যারা সৎ পথে আছে তাদেরকে তিনিই সৎ পথে রাখেন। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, সমস্ত তাঁরই হুকুমে বরং তাঁরই কুদরতে ঘটে থাকে। তাঁর কুদরত এবং হুকুম ব্যতীত একটি বিন্দুও নড়তে পারে না। তাঁর নিদ্রাও নেই তন্দ্রাও নেই। নিখিল বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না। তিনিই সমস্ত কিছু রক্ষা করছেন। ফলকথা, তাঁর মধ্যে যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণ আছে এবং দোষ-ত্রুটির নাম-গন্ধও তাঁর মধ্যে নেই। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে অতি পবিত্র।

৭। তাঁর যাবতীয় গুণ অনাদিকাল হতে আছে এবং চিরকালই থাকবে। তাঁর কোন গুণই বিলোপ বা কম হতে পারেনা।

৮। জ্বিন ও মানব ইত্যাদি সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলী হতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র[2]। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে, যা আমাদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্রও আছে বলে উল্লেখ আছে (যেমন, বলা হয়েছে- আল্লাহ্র হাত আছে) তথায় এরূপ ঈমান রাখা দরকার যে, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন। আমরা বেশী বাড়াবাড়ি না করে এ ঈমান এবং একীন রাখবো যে, এর অর্থ আল্লাহ্র নিকট যাই হউক

---

১. ঘটনাক্রমে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহ্র সামনে অত্যন্ত লজ্জিত ও শরমিন্দা হয়ে মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনও আমি এরূপ কাজ করবো না, একেই 'তাওবা' বলে।

২. আল্লাহ্ স্রষ্টা। আল্লাহ্ ব্যতীত দৃশ্য-অদৃশ্য যতকিছু আছে, যথা আসমান, জমীন, ফিরিশতা, জ্বিন, মানব, চন্দ্র, সূর্য, আরশ, কুরসী, লৌহ ও ক্বলম ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ্র সৃষ্ট পদার্থ। সমস্তই সাকার, সীমাবদ্ধ, ধ্বংসশীল এবং মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না বা আল্লাহ্র অনুরূপ কিছুই নেই। কুরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা কেউ আল্লাহকে অনুরূপ মনে করবে না। আল্লাহ্ এগুলো হতে বহু বহু উর্ধ্বে। মানবের বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্র সৃষ্টি পদার্থ। সুতরাং মানবের বুদ্ধি-বিবেকের সীমা দ্বারা আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ নহেন। আল্লাহ্ অসীম, নিরাকার, নিরঞ্জন, অনাদি, অনন্ত ও তাঁর দেখা-শুনা, কথা বলা, হাসা, তাঁর হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি তিনি যেমন মহান এবং পবিত্র তাঁর এ সমস্ত গুণ ও তদ্রূপ মহান এবং পবিত্র।

না কেন, তাই ঠিক এবং সত্য, তা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। এরূপ ধারণা রাখাই ভাল। তবে কোন বড় ,মুহাক্কিক আলিম এরূপ শব্দের কোন সুসঙ্গত অর্থ বললে তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বলা সকলের কাজ নয়। যারা আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা তাঁরাই বলতে পারেন; তাও শুধু তারই বুদ্ধি মত ; নতুবা আসল একীনী অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। এরূপ শব্দ বা কথা বুঝে আসে না, এগুলোকে 'মুতাশাবেহাত' বলা হয়।

৯। সমগ্র দুনিয়ার ভাল-মন্দ যা কিছু হউক না কেন, সমস্তই আল্লাহ্‌ তা'আলা তা হওয়ার পূর্বেই আদিকাল হতে অবগত আছেন। তিনি যেরূপ জানেন তা সেরূপই পয়দা করেন একেই 'তাক্বদীর' বলে। আর মন্দ জিনিস পয়দা করার মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত আছে। যা সকলে বুঝতে পারে না।

১০। মানবকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বুদ্ধি অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিবেচনা শক্তি এবং ভালমন্দ বিবেচনা করে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কাজ করার শক্তি দান করেছেন। এ শক্তি দ্বারাই মানুষ সৎ, বা অসৎ, ছওয়াব বা গোনাহ্‌ নিজ ক্ষমতায় করে। কিন্তু কোন কিছু পয়দা করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। গোনাহ্‌র কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং নেক কাজে সন্তুষ্ট হন।

১১। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে তাদের শক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করার আদেশ করেননি।

১২। আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু মেহেরবানী করে করেন, সমস্তই শুধু তাঁর কৃপা এবং অনুগ্রহ মাত্র। কিছু বান্দাদের নেক কাজে যে সমস্ত ছওয়াব নিজেই মেহেরবানী করে দিতে চান তা নিশ্চয়ই দিবেন, যেন তা ওয়াজিবেরই মত।

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা

১৩। বহুসংখ্যক পয়গম্বর মানব এবং জ্বিন জাতিকে সৎপথ দেখাবার জন্য আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন; আমাদেরকে তা বলা হয়নি। তাঁদের সত্যতার প্রমাণ (জনসাধারণকে) দেখাবার জন্য তাঁদের

হয়েছে যে, তা অন্য লোক করতে পারে না। এ ধরনের কাজকে মু'জিযা বলে।

পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ ছিলেন আমাদের হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্যান্য সব পয়গম্বর এ দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন পয়গম্বরের নাম অনেক প্রসিদ্ধ যেমনঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত দাঊদ (আঃ),হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ইল্‌য়াছ (আঃ) হযরত লূত (আঃ), হযরত যুলকিফ্‌ল (আঃ), হযরত ছালেহ্‌ (আঃ), হযরত হূদ (আঃ), হযরত শোআইব (আঃ)।

১৪। পয়গম্বরদের মোট সংখ্যা কত তা আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকেও বলেননি। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা যত পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তা জানা থাক বা না থাক, সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রাখতে হবে। অর্থাৎ, সকলকেই সত্য ও খাঁটি বলে মান্য করতে হবে। যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পয়গম্বর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

১৫। পয়গাম্বরদের মধ্যে কারও মর্যাদা কারও চেয়ে অধিক। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্তুবা আমাদের হুযূর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তাঁর পর আর কোন নতুন নবী কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না, আসতে পারে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যই তিনি নবী।

১৬। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় এক রাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কা শরীফ হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং তথা হতে সাত আসমানের উপর এবং তথা হতে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার মর্যী হয়েছিল সে পর্যন্ত নিয়ে আবার মক্কা শরীফে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একে 'মি'রাজ' শরীফ বলে।

ফিরিশ্‌তা সম্পর্কে আক্বীদা

১৭। আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক জীব নূর দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের চর্ম চক্ষুর আড়ালে রেখেছেন। তাদেরকে 'ফিরিশ্‌তা' বলে। অনেক কাজ তাঁদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁরা কখনও আল্লাহ্‌র হুকুমের খিলাফ কোন কাজ করেন না। আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে যে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন তাঁরা সে কাজেই লিপ্ত আছেন। এ সমস্ত ফিরিশ্‌তার মধ্যে চারজন ফিরিশ্‌তা অনেক প্রসিদ্ধ ঃ ১। হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ), ২। হযরত মিকায়ীল (আঃ) ৩। হযরত ইসরাফীল (আঃ), ৪। হযরত ইযরায়ীল (আঃ)।

জ্বিন সম্পর্কে আক্বীদা

আল্লাহ্ তা'আলা আরও কিছু সংখ্যক জীব অগ্নি দ্বারা পয়দা করেছেন, তাদেরকেও আমরা দেখতে পাই না। এদেরকে 'জ্বিন' বলা হয়। এদের মধ্যে ভাল-মন্দ, নেককার, বদকার- সব রকমই আছে। এদের ছেলে-মেয়েও জন্মে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মশহূর দুষ্ট বদমাশ হলো ইবলীস।

অলীদের সম্পর্কে আক্বীদা

১৮। মুসলমান যখন অনেক ইবাদত বন্দেগী করে, গোনাহ্‌র কাজ হতে বেঁচে থাকে, অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রাখে না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ তাবে'দারী করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দোস্ত এবং খাছ পিয়ারা বান্দায় পরিণত হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র 'অলী' বলে। আল্লাহ্‌র অলীদের দ্বারা সময় সময় এ রকম কাজ হয়ে থাকে, যা সাধারণ লোক দ্বারা হতে পারে না, এ রকম কাজকে 'কারামাত' বলে।

১৯। অলী যত বড়ই হইক না কেন, কিন্তু নবীর সমান হতে পারে না।

২০। যত বড় অলীই হউক না কেন, কিন্তু যে পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি

ঠিক থাকে, সে পর্যন্ত শরী'অতের পাবন্দী করা তাঁর উপর ফরয। নামায, রোযা, ইত্যাদি কোন ইবাদতই তার জন্য মাফ হতে পারে না। যে সকল কাজ শরী'অতে হারাম বলে নির্ধারিত আছে তাও তাঁর জন্য কখনও হালাল হতে পারে না।

২১। শরী'অতের খিলাফ করে কিছুতেই খোদার দোস্ত (অলী) হওয়া যায় না। এরূপ 'খেলাফে শর'আ (শরী'অত বিরোধী) লোক দ্বারা যদি কোন অদ্ভুদ ও অলৌকিক কাজ সম্পন্ন হতে থাকে, তবে তা হয়তো যাদু না হয় শয়তানের ধোঁকাবাজী। অতএব, এরূপ লোককে কিছুতেই বুযুর্গ মনে করা উচিত নয়।

২২। আল্লাহ্‌র অলীগণ কোন কোন ভেদের কথা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় জানতে পারেন, একে 'কাশ্‌ফ' বা 'এলহাম' বলে। যদি তা শরী'অত সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নয়।

বিদ্‌'আত

২৩। আল্লাহ্ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন, হাদীছে দ্বীন (ধর্ম) সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বলে দিয়েছেন। এখন দ্বীন সম্পর্কে কোন নতুন কথা আবিস্কার করা বৈধ নয়। এরূপ (দ্বীন-সম্বন্ধীয়) নতুন কথা আবিষ্কারকে 'বিদ'আত' বলে। যা বড়ই গোনাহ্।

কিতাব সম্পর্কে আক্বীদা

২৪। পয়গম্বরগণ যাতে নিজ নিজ উম্মতদিগকে ধর্মের কথা শিক্ষা দিতে পারেন, সে জন্য তাঁদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ছোট, বড় অনেকগুলো আসমানী কিতাব জিব্‌রায়ীল (আঃ) মারফত নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে চারখানা কিতাব অতি প্রসিদ্ধ (১) তাউরাত, হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর (২) যাবূর, হযরত দাঊদ (আঃ) এর উপর (৩) ইঞ্জীল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর (৪) কুরআন শরীফ, আমাদের

---

১. অনেক সময় জ্বিন তাবে' করে বা নফসের তাছাররোফের দ্বারা অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করা হয়, এতে বুযুর্গী কিছুই নেই।

পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। কুরআন শরীফই শেষ আসমানী কিতাব। কুরআনের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ্র তরফ হতে নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। অন্যান্য কিতাবগুলোতে গোমরাহ লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে, কিন্তু কুরআন শরীফ হিফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই নিয়েছেন। অতএব, একে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আক্বীদা

২৫। যে সকল মুসলমান ঈমানদার অবস্থায় আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন অতঃপর ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদেরকে সাহাবী বলে। সাহাবীদের অনেক মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁদের সকলের সঙ্গে মুহাব্বত এবং ভক্তি রাখা আবশ্যক। তাঁদের মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ যদি কিছু শোনা যায় তা ভুল-ক্রটি বশতঃ হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কারণ, মানব মাত্রেই ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের কারো নিন্দা করা যাবে না। সাহাবীদের মধ্যে চারজন সাহাবী সবচেয়ে বড়। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীন ইসলাম রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন, তাই তাঁকে প্রথম খলীফা বলা হয়। সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর তিনিই শীর্ষস্থানীয়। তারপর হযরত 'উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু দ্বিতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু তৃতীয় খলীফা হন। তারপর হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন।

২৬। সাহাবীদের মর্তবা এত উচ্চস্থানীয় যে, বড় হতে বড় অলী ছোট হতে ছোট সাহাবীর সমতুল্য হতে পারে না।

২৭। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল পুত্র-কন্যা এবং বিবি সাহেবাগণের প্রতিও সম্মান ও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য। সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আন্হার মর্তুবা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং বিবি ছাহেবানদের মধ্যে হযরত খাদীজা

রাযিয়াল্লাহু আন্হা ও হযরত 'আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার মর্তুবা সবচেয়ে বেশী।

যে কারণে ঈমান চলে যায়

২৮। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল যা কিছু বলেছেন, সকল বিষয়কেই সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং মেনে নেওয়া ব্যতীত ঈমান ঠিক হতে পারে না। কোন একটি কথায়ও সন্দেহ পোষন করলে বা মিথ্যা বলে মনে করলে বা কিছু দোষ-ক্রটি ধরলে বা কোন একটি কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে মানুষ বে-ঈমান হয়ে যায়।

২৯। কুরআন হাদীছের স্পষ্ট অর্থ অমান্য করে নিজের মত পোষণের জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ বদ্দ্বীনির কথা।

৩০। গোনাহ্কে হালাল জানলে ঈমান থাকে না।

৩১। গোনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, যে পর্যন্ত তা গোনাহ্ এবং অন্যায় বলে স্বীকার করবে, সে পর্যন্ত ঈমান একেবারে নষ্ট হবে না, অবশ্য ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যাবে।

৩২। যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) ভয় কিংবা (রহমতের) আশা নেই তারা কাফির।

৩৩। যে ব্যক্তি কারো কাছে গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাতে বিশ্বাস করে, সে কাফির।

৩৪। গায়েবের কথা এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ অবগত নয়। হাঁ পয়গম্বর ছাহেবান অহী মারফত, ওলীআল্লাহ্গণ কাশ্ফও এল্হাম মারফত এবং সাধারণ লোক লক্ষণ দ্বারা যে, কোন কোন কথা জানতে পারেন তা গায়েব নয়।

৩৫। কাউকে নির্দিষ্ট করে 'কাফির' কিংবা (নির্দিষ্ট করে) এরূপ বলা যে. 'অমুকের উপর খোদার লা'নত হোক' অতি বড় গোনাহ্। তবে এরূপ বলা যেতে পারে যে, অত্যাচারীদের উপর খোদার লা'নত হউক। কিন্তু যাকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল কাফির বলেছেন, তাকে (নির্দিষ্টভাবে) কাফির বলা যেতে পারে। যথা-ফির'আউন। বা অন্য যাকে তাঁরা লা'নত করেছেন তার উপর লা'নত করা যেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আক্বীদা

৩৬। মানবের মৃত্যুর পর (যদি কবর দেওয়া হয়, তবে কবর দেওয়ার পর আর যদি কবর দেওয়া না হয়, তবে যে অবস্থায়ই থাকুক সে অবস্থাতেই) তার নিকট মুন্‌কার এবং নকীর নামক দু'জন ফিরিশ্‌তা এসে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার মা'বুদ কে? তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি? এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? যদি মুরদা ঈমানদার হয়, তবেতো ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। অতঃপর খোদার পক্ষ হতে তার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। বেহেশ্‌তের দিকে ছিদ্রপথ করে দেওয়া হয়, তাতে সুশীতল বায়ূ এবং নির্মল সুগন্ধ প্রবেশ করতে থাকে, আর সে পরম সুখের নিদ্রায় ঘুমাতে থাকে। আর মৃত ব্যক্তি ঈমানদার না হলে, সে সকল প্রশ্নের উত্তরেই বলে 'আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই জানি না।' অতঃপর তাকে কঠিন আযাব দেয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে কঠিন আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর কোন কোন বান্দাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে এরূপ পরীক্ষা হতে অব্যাহতি দিয়ে থাকেন ; কিন্তু এ সকল ব্যাপার মৃত ব্যক্তিই জানতে পারে, আমরা কিছুই অনুভব করতে পারি না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখতে পায়, আমরা জাগ্রত অবস্থায় তার নিকটে থেকেও তা পাই না।

৩৭। মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার আসল ও স্থায়ী বাসস্থান দেখানো হয়। যে বেহেশ্‌তী হবে তাকে বেহেশ্‌ত দেখিয়ে তার আনন্দ বর্ধন করা হয়, দোযখীকে দোযখ দেখিয়ে তার কষ্ট এবং অনুতাপ আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়।

৩৮। মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ বা কিছু দান খয়রাত করে তার ছওয়াব তাকে বখশিয়া দিলে তা সে পায় এবং তাতে তার খুবই উপকার হয়।

কিয়ামতের আলামত

৩৯। আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল কিয়ামতের যে সমস্ত 'আলামত বর্ণনা করেছেন তা সবই নিশ্চয় ঘটবে। ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করবেন এবং অতি ন্যায়পরায়নতার সাথে রাজত্ব করবেন। কানা দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, সে দুনিয়ার মধ্যে বড় ফেৎনা ফাসাদ করবে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হতে অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। ইয়াজুজ মা'জুজ (এক জাতি) সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, সব তছনছ করে দিবে। অবশেষে খোদার গযবে ধ্বংস হবে। এক অদ্ভুত জীব মাটি ভেদ করে বের হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে। সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে এবং পশ্চিম দিকেই অস্ত যাবে। কুরআন মাজীদ উঠে যাবে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান প্রাণ ত্যাগ করবে। শুধু কাফিরই কাফির থেকে যাবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। এ রকম আরো অনেক 'আলামত আছে।

কিয়ামত সংগঠিত হওয়া

৪০। যখন সমস্ত আলামত প্রকাশ পাবে, তখন হতে কিয়ামতের আয়োজন শুরু হবে। হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। এই সিঙ্গা শিং-এর আকারের প্রকান্ড এক রকম জিনিষ। সিঙ্গায় ফুঁক দিলে আসমান যমীন সমস্ত জিনিষ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যাবতীয় সৃষ্ট জীব মারা যাবে। যারা পূর্বে মারা গেছে তাদের রূহ্‌ বেহুশ হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাবেন সে নিজের অবস্থাই থাকবে। এ অবস্থায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবে।

হাশরের ময়দান

৪১। আবার যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সমস্ত আলম (জগত) পুণর্বার সৃষ্টির ইচ্ছা করবেন, তখন দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সমস্ত আলম জীবিত হয়ে উঠবে। সমস্ত মৃত লোক জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে এবং তথাকার অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, সুপারিশ করাইবার জন্য পয়গম্বরদের নিকট যাবে কিন্তু সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। পরিশেষে আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতি নিয়ে সুপারিশ করবেন। নেকী-বদি পরিমাপের জন্য মীযান (পাল্লা) স্থাপন করা হবে। ভাল-মন্দ সমস্ত কর্মের পরিমাণ ঠিক করা হবে এবং তার হিসেব হবে। কেউ কেউ বিনা হিসেবে বেহেশ্‌তে যাবে। নেক্‌কারদের

আমলনামা তাঁদের ডান হাতে এবং গোনাহ্‌গারদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (নেক) উম্মতকে হাউযে কাউছারের পানি পান করাবেন। সে পানি দুধ হতেও সমধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু। সকলকে পুলছিরাত পার হতে হবে। নেক্‌কারগণ সহজে তা পার হয়ে বেহেশ্‌তে পৌঁছবেন, আর পাপীরা তার উপর হতে দোযখের মধ্যে পরে যাবে।

দোযখ সম্পর্কে আক্বীদা

৪২। দোযখ এখনও বর্তমান আছে। তাতে সাপ, বিচ্ছু এবং আরও অনেক কঠিন কঠিন আযাবের ব্যবস্থা আছে। যাদের মধ্যে সামান্য হলেও ঈমান থাকবে, যত বড় গোনাহ্‌গারই হোক না কেন, তারা নিজ নিজ গোনাহ্‌র পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর নবীগণের এবং বুযুর্গদের সুপারিশে নাজাত পেয়ে বেহেশ্‌তে যাবে। আর যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান নেই, অর্থাৎ, যারা কাফির ও মুশ্‌রিক, তারা চিরকাল দোযখের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না।

বেহেশ্‌ত সম্পর্কে আক্বীদা

৪৩। বেহেশ্‌ত এখনও বিদ্যমান আছে। সেখানে বিভিন্ন সুখ-শান্তি এবং আমোদ-প্রমোদের অসংখ্য উপকরণ আছে। যারা বেহেশ্‌তী হবেন, কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা তাদের থাকবে না। সেখানে তাঁরা চীরকাল অবস্থান করবেন। তাদেরকে কখনও তথা হতে বহিস্কার করা হবে না ; আর সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না।

৪৪। ছোট হতে ছোট গোনাহ্‌র কারণেও আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন। আবার বড় হতে বড় গোনাহ্‌ও মাফ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার সব কিছুরই ক্ষমতা আছে।

৪৫। শিরক্ এবং কুফরির গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেও মাফ করবেন না ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা

ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। তাঁর কোন কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না।

৪৬। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করে বেহেশ্‌তী বলেছেন, তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকেও আমরা সুনিশ্চিতভাবে বেহেশ্‌তী হওয়া সাব্যস্ত করতে পারিনা। তবে নেক আলামত দেখে (অর্থাৎ আমল আখ্‌লাক ভাল হলে) ভাল ধারণা এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা করা কর্তব্য।

৪৭। বেহেশ্‌তে আরামের জন্য অসংখ্য নিয়ামত এবং অপার আনন্দের অগণিত সামগ্রী বিদ্যমান আছে। সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে অধিক আনন্দদায়ক নেয়ামত হবে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ। বেহেশ্‌তীদের ভাগ্যে এ নিয়ামত জুটবে। এ নিয়ামতের তুলনায় অন্যান্য নিয়ামত কিছুই নয় বলে মনে হবে।

৪৮। জাগ্রত অবস্থায় চর্ম-চক্ষে এ দুনিয়ায় কেউই আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেনি, দেখতে পারেও না। অবশ্য বেহেশ্‌তে বেহেশ্‌তীগণ দেখতে পাবেন।

৪৯। সারা জীবন যে যেরূপই হউক না কেন, কিন্তু খাতিমা (অন্তিমকাল) হিসাবেই ভাল-মন্দের বিচার হবে। যার খাতিমা ভাল হবে, সেই ভাল এবং সে পুরস্কারও ভাল পাবে। আর যার খাতিমা মন্দ হবে (অর্থাৎ, বেঈমান হয়ে মরবে) সেই মন্দ এবং তাকে মন্দ ফলও ভোগ করতে হবে।

৫০। সারা জীবনের মধ্যে মানুষ যখনই তাওবা[১] করুক বা ঈমান আনুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেন, কিন্তু মৃত্যুকালে যখন প্রাণ বের হতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাকে নজরে দেখতে পায়, তখন তাওবাও কবূল হয় না এবং ঈমানও কবূল হয় না।

---

১. গোনাহ্ পরিত্যাগ করতঃ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাকে তাওবা বলে এবং কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহ্, রাসূল এবং ইসলাম ধর্মের বিধানাবলী মানার অঙ্গীকার করাকে 'ঈমান' বলে।

ভ্রান্ত আক্বীদা

সহীহ ঈমান এবং আক্বায়েদের বর্ণনার পর কিছু খারাপ আক্বীদা ও খারাপ প্রথা এবং কিছু সংখ্যক বড় বড় গোনাহ্ যা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং যার কারণে ঈমানের সর্বাত্মক ক্ষতি হয়, তার বর্ণনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি, যেন জনগণ সেসব হতে বেঁচে থাকতে পারে। এর মধ্যে কোনটিতো, একেবারেই কুফর ও শিরক্মূলক। কোনটি প্রায়ই কুফর ও শিরক্মূলক। কোনটি বিদ্'আত এবং গোমরাহী। আর কোনটি শুধু গোনাহ্। মোটকথা, এর সবগুলোর হতেই বেঁচে থাকা একান্ত আবশ্যক। আবার যখন এগুলোর বর্ণনা শেষ হবে। তখন গোনাহ্ করলে দুনিয়াতেই যে সব ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করলে দুনিয়াতেই যে সব লাভ হয়, তা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে। কারণ, মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার লাভ-লোকসানের দিকেই বেশী লক্ষ্য করে থাকে, তাই হয়তো কেউ এ ধারণায়ও কোন কোন নেক কাজ করতে পারে বা কোন গোনাহ্ হতে দূরে থাকতে পারে।

শির্ক ও কুফ্র

কুফ্র পছন্দ করা। কুফরী কোন কাজ বা কথাকে ভাল মনে করা[১]। অন্য কারো দ্বারা কুফ্রমূলক কোন কাজ করান বা কুফ্রমূলক কোন কথা বলান। কোন কারণবশতঃ নিজের মুসলমান হওয়ার উপর আক্ষেপ করা, যে, হায়! যদি মুসলমান না হতাম, তবে এ রকম উন্নতি লাভ করতে পারতাম বা এ রকম সম্মান পেতাম। ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। সন্তান বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুশোকে এ রকম কথা বলা 'খোদা তা'আলা মারার জন্য সংসারে আর কাউকে পায় নাই, ব্যস একেই পেলো, এর জীবনটা লওয়াই খোদা তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'লার জন্য এ রকম করা ভাল হয়নি বা উচিত ছিলনা, এরকম জুলুম কেউ করে না। ইত্যাদি।

১. আজকাল কোন কোন ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী যুবক হিন্দু ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রশংসা করে ইসলামের নিন্দা করে থাকে। এতে ঈমান থাকে না।

আরও অনেক বেহুদা কথা যা সাধারণত ঃ মূর্খেরা শোকে বিহবল হয়ে বলে থাকে।

খোদা বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুমকে মন্দ জানা বা তার মধ্যে কোন প্রকার দোষ বের করা। কোন নবী বা ফিরিশ্তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে করা। কোন অলী বা বুযুর্গ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় তিনি সব সময় আমাদের সকল অবস্থা জানেন। গণক কিংবা যার উপর জ্বিনের আছর হয়েছে, তার নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা বা হাত ইত্যাদি দেখিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করান এবং তাতে বিশ্বাস করা। কোন বুযুর্গের কালাম হতে ফাল বের করে তাকে দৃঢ় সত্য মনে করা। কোন পীর বা অন্য কাউকে দূর হতে ডেকে মনে করা যে, তিনি আমার ডাক শুনেন। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে লাভ লোকসানের ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজের মকছুদ..টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, রুযি-রোযগার সন্তান ইত্যাদি চাওয়া। কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কাউকে সিজদা করা। কারও নামে রোযা রাখা বা কারও নামে গরু ছাগল ইত্যাদি কোন জানোয়ার ছেড়ে দেয়া বা দরগাহে মান্নত মানা। কোন কবর বা দরগাহ্ বা পীর-বুযুর্গের ঘরের তাওয়াফ করা। (অর্থাৎ, চতুর্দিকে ঘোরা।) খোদা বা রাসূলের হুকুমের উপর অন্য কারও হুকুমকে বা কোন দেশ-রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথাকে বা নিজের কোন পুরাতন অভ্যাসকে বা বাপ-দাদার কালের কোন দস্তুরকে পছন্দ বা অবলম্বন করা । কারও সামনে সম্মানের জন্য (সালাম ইত্যাদি করিবার সময়) মাথা নোয়ানো বা কারও সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা। কারও নামে কোন জানোয়ার যবাহ্ করা। উপরি দৃষ্টি বা জ্বিনের আছর ছাড়াইবার জন্য তাদের ভেট (নযরানা বা ভোগ) দেয়া। কা'বা শরীফের মত অন্য কোন জায়গার আদব বা তা'যীম করা। কারও নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ও বালি, বোলাক ইত্যাদি পরানো। কারও নামে বাজুতে পয়সা বা গলায় সূতা বাঁধা। নব বরের মাথায় সহরা অর্থাৎ, ফুলের মালা বাঁধা, (এটা হিন্দুদের রসম)।

টিকি রাখা। (কারও নামে চুল রাখা,) কারও নামে ফকীর বানান। আলী বখ্শ, হোসাইন বখ্শ, আবদুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা। (এরূপ এক কড়ি, বদন, পবন, গমন ইত্যাদি নাম রাখা) কোন প্রাণীর নাম কোন বুযুর্গের নাম অনুযায়ী রাখিয়া তার তা'যীম করা। পৃথিবীতে যা কিছু হয়, নক্ষত্রের তাছীরে হয় বলে মনে করা। ভাল বা মন্দ দিন তারিখ জিজ্ঞাসা করা। লক্ষণ ধরা জিজ্ঞাসা করা[১] কোন মাস বা তারিখকে মন্হুছ (খারাপ) মনে করা। কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপা। এরূপ বলা, যদি খোদা রাসূল চায়, তবে এ কাজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, খোদার সঙ্গে রাসূলকেও শামিল করা। কারও নামের বা মাথার কসম খাওয়া। ছবি রাখা বিশেষতঃ বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা এবং তার তা'যীম করা। এর কোনটা কুফর, আবার কোনটা শিরক।

বিদ্আ'ত ও কু-প্রথা

কোন (বুযুর্গের) দরগায় ধুমধামের সাথে মেলা বা ওরস করা। বাতি জ্বালান। মেয়েলোকের তথায় যাওয়া। চাদর দেওয়া। কবর পাকা করা। কোন বুযুর্গকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর কবরকে অতিরিক্ত তা'যীম করা। কবর বা তা'যিয়া চুম্বন করা। কবরের মাটি শরীরে মাখা। তা'যীমের জন্য কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা (ঘোরা)। কবর সিজদা করা। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। মিঠাই ইত্যাদি দরগাহে মানা বা দেওয়া। তা'যিয়া নিশান ইত্যাদি রেখে, তার উপর হালুয়া বাতাশা প্রভৃতি রাখা। তাকে সালাম করা। কোন জিনিসকে অচ্ছ্যুৎ লাগান। শুধু নিরামিষ খাওয়া, মাছ-গোস্ত না খাওয়া। স্বামীর কাছে না যাওয়া। লাল কাপড় না পরা ইত্যাদি। বিবি ফাতেমার নামে ফাতেহার উদ্দেশ্যে মাটির বরতনে খানা রাখাকে ছেহ্নক বলে, এটা করা এবং তা হতে পুরুষদিগকে খেতে না দেয়া। প্রকাশ থাকে যে, এমন করাটা মেয়েদের জন্যও জায়িয নেই।

১. যেমন প্রথা আছে যে, হাত চুলকালে হাতে টাকা আসবে। হাঁচি দিলে কার্য সিদ্ধি হবে না। ডান চোখ লাফালে ভাল হবে, বাম চোখ লাফালে বিপদ আসবে।

কেউ মারা গেলে তিজা, চল্লিশা, কুলখানী জরুরী মনে করে করা। (অর্থাৎ, ৩দিনের দিন বা ৪০ দিনের দিন মোল্লা মুন্সী বা যারা দাফন করতে আসে, জরুরী মনে করে তাদেরকে খাওয়ান বা বদনামীর ভয়ে ধুমধামের সাথে যিয়াফত করা।) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিধবার বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। বিবাহের সময়, খাৎনার সময়, বিস্মিল্লাহ্র সবক দেওয়ার সময়, কেউ মারা গেলে, অসাধ্য সত্ত্বেও খান্দানী রসূমসমূহ বজায় রাখা। (সামাজিক প্রথাগুলি ঠিক রাখা)। বিশেষতঃ টাকা কর্জ করিয়া নাচ-গান রং-তামাশা প্রভৃতি করান। হিন্দুদের কোন পূজা বা তেহার, হুলি, দেওয়ালী, বিয়ের মুখ দেখানো বা অন্যান্য অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগদান করা। 'আসসালামু আলাইকুম, না বলে তার পরিবর্তে আদাব নমস্কার, প্রণিপাত ইত্যাদি বলা অথবা কেবল হাত উঠিয়ে মাথা ঝুঁকান[১]। দেওর, ভাশুর, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, চাচাত ভাই, খালাতো ভাই, ননদের স্বামী, নুনাষের স্বামী বা ধর্ম ভাই, ধর্ম বাপ প্রভৃতির বা অন্য কোন না-মাহরম[২] আত্মীয়ের সাথে দেখা দেওয়া। গান বাদ্য শোনা, নাচ দেখা বা তাদের গান বাদ্যে বা নাচে সন্তুষ্ট হয়ে বখ্শিশ দেয়া। নিজের বংশের গৌরব করা বা কোন বুযুর্গের খান্দানের হওয়া বা বুযুর্গের কাছে শুধু মুরীদ হওয়াকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা। কারও বংশের মধ্যে দোষ থাকলে তা বের করে নিন্দা করা। কোন জায়িয পেশাকে অপমানজনক মনে করা। (যেমন, মাছ বিক্রি করা, মজদুরী করা, জুতা সেলাই করা ইত্যাদি) কারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা। বিবাহ-শাদীতে বেহুদা খরচ

১. এসকল কুসংস্কার হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে এসেছে। এরকম আরও অনেক কুসংস্কার মুর্খতাবশতঃ সমাজে ঢুকেছে। যেমন– যে দিন ধার বুনে সে দিন খৈ ভাজে না, যে হাঁড়িতে করে তিল বুনে সে হাঁড়ি বাড়ীতে আনলে মাটিতে রাখে না, কলাগাছ লাগানোর সময় উপরের দিকে দেখে না, নারিকেল, সুপারী, পান গাছ লাগায় না ইত্যাদি।

২. শরী'অত মত যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়িয তাদেরকে 'না-মাহরম' বলে।

করা এবং অন্যান্য যে সব বেহুদা কাজ আছে তা করা। (যেমন পণ লওয়া, খরচ বাবদ লওয়া, ঘাট-সেলামী, আগবাড়ানী, অন্দর সেলামী, হাত ধোয়ানী, চিনি-মুখী প্রভৃতি বেহুদা খরচ আদায় করা) সুন্নত তরীকা ছেড়ে দিয়ে এতদ্দেশে যে সব প্রথা প্রচলিত আছে, তা পালন করা। নওশাকে শরী'অতের খেলাপ পোষাক পরান। বরের হাতে কাঙ্গন বাঁধা, মাথায় ছহ্‌রা বাঁধা। বরের হাতে মেহেন্দী লাগান। আতশবাজী ফুটান ইত্যাদি অনর্থক কাজে টাকা অপব্যয় করা। বরকে বাড়ীর ভিতর এনে তার সামনে না-মাহরম মেয়েলোকের আসা। এরূপ পরপুরুষের সামনে বৌয়ের মুখ দেখানো বা অন্যান্য আত্মীয়দের এনে বৌ দেখান আরও গর্হিত কর্ম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দুলহাকে দেখা। বয়স্কা শালীদের সামনে আসা এবং হাসি ঠাট্টা করা, চৌথী খোলান, যে ঘরে বর ও কনে শয়ন করে, সে ঘরের আশেপাশে থেকে তাদের কথাবার্তা শোনা বা উঁকি দিয়ে দেখা এবং যদি কোন কথা জানতে পারে, তবে অন্যকে জানানো। বিয়ের সময় লজ্জায় নামায পর্যন্ত ত্যাগ করা। শোকে-দুঃখে চীৎকার করে ক্রন্দন করা বা বুক চাপড়াইয়া বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলা। যে সব কাপড় মৃতের গায়ে লাগিয়াছে সে সব নাপাক না হলেও ধোয়া জরুরী মনে করা। যে গৃহে লোক মারা গেছে সে ঘরে বৎসর খানেক বা কিছু কম বেশী দিন না যাওয়া বা কোন খুশীর কাজ (যেমন, বিবাহ ইত্যাদি) না করা। নির্দিষ্ট তারিখে আবার শোককে তাজা করা। অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করা। সাদাসিদা লেবাস-পোশাককে ঘৃণা করা। ঘরে জীব-জন্তুর ছবি লাগান। সোনা-রুপার পানদান, সুরমাদান, বাসন, পেয়ালা ব্যবহার করা। শরীর দেখা যায় এইরূপ পাতলা কাপড় পরিধান করা। বাজনাদার অলংকার ব্যবহার করা। পুরুষদের সভায় মেয়েদের যাওয়া। বিশেষতঃ তা'যিয়া, ওরস বা মেলা দেখতে যাওয়া। স্ত্রীলোকদের এরূপ পোশাক পরা যাতে পুরুষের মত

দেখা যায় এবং পুরুষদের এমন পোশাক পরা যাতে স্ত্রীলোকের মত দেখা যায়। শরীরে গুদানী দেওয়া[১]। বিদেশে যাবার সময় বা বিদেশ হতে এসে কোন 'নামাহরমের' সঙ্গে মো'আনাকা করা[২]। সন্তান জীবিত থাকার জন্য তার নাক-কান ছিদ্র করা। পুত্র সন্তানকে বালা, ঘুগরা ইত্যাদি অলংকার পরান বা রেশমী কাপড় পরান। ছেলেপেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আফিং বা নিশাদার জিনিস খাওয়ান। এ রকম আরও অনেক বিষয় আছে, কোনটি শির্‌ক ও কুফ্‌রমূলক, আর কোনটি বিদ্'আত ও হারাম। চিন্তা করলে বা কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করলে বেশী জানা যাবে। নমূনা স্বরূপ এতটুকু বর্ণনা করা হলো।

কতিপয় বড় বড় গোনাহ্

খোদার সঙ্গে অপর কাউকেও শরীক করা। অনর্থক খুন করা। (মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা বা বান মেরে যে কাউকে মারা হয় তাতেও খুন করার গোনাহ্ হবে।) বন্ধ্যা রমণীর এমন টোটকা করা যে, অমুকের সন্তান মরে যাবে এবং তার সন্তান পয়দা হবে, এটাও খুনের শামিল। মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। যিনা (ব্যভিচার) করা। এতীমের মাল খাওয়া। যেমন, অনেক স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হয়ে বসে এবং নাবালেগ ছেলেমেয়েদের অংশে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করে। মেয়েদের হক বা অংশ না দেওয়া। সামান্য কারণেই কোন স্ত্রীলোকের উপর যিনার তোহ্‌মত (দোষ) দেওয়া। কার উপর জুলুম করা। অসাক্ষাতে কারও বদনাম করা। আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া। ওয়াদা করে তা পুরা না করা। আমানতে খিয়ানত করা। খোদা তা'আলার কোন ফরয, যেমন-নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়া। কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। মিথ্যা

১. শরীরে কোন জীবের ছবি বা নাম অঙ্কন করা।
২. আলিঙ্গন করা বা হাত মিলানো।

কথা বলা। বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কসম খাওয়া বা এরকম কসম খাওয়া যে, মরণকালে যেন কালিমা নছীব না হয়, বা ঈমানের সাথে মউত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সিজ্দা করা। বিনা উযরে নামায ক্বাযা করা। কোন মুসলমানকে বে-ঈমান কাফের বা খোদার দুশমন বলা বা এ রকম বলা যে, তার উপর খোদার লা'নত হউক, খোদার গযব পড়ুক। কারও নিন্দাবাদ, গীবত শেকায়েত করা বা শোনা। চুরি করা। সূদ খাওয়া। ঘুষ খাওয়া। ধান-চাউলের দর বাড়লে মনে মনে খুশী হওয়া। দাম ঠিক করে আবার পরে কম নেওয়া (যেমন সাধারনতঃ নামের জন্য বড় লোকেরা গরীব লোকদের সঙ্গে করে থাকে।) না-মাহরমের[১] কাছে নির্জনে একাকী বসা। জুয়া খেলা। কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত রেওয়াজ (প্রথা) পছন্দ করা। খাবার কোন জিনিসকে মন্দ বলা। নাচ দেখা। গান-বাদ্য শোনা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নছীহত না করা। হাসি-তামাশা করে কাউকেও লজ্জা দেওয়া এবং অপমানিত করা। পরের দোষ দেখা। ইত্যাদি কবীরা (বড়) গুনাহ্।

গোনাহ্র কারণে পার্থিব ক্ষতি

গোনাহ্র কারণে ইল্ম হতে মাহ্রূম থাকতে হয়। রুজিতে বরকত হয় না। ইবাদতে মন বসে না। নেক লোকের সংসর্গ ভাল লাগে না। অনেক সময় কাজে না প্রকার বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অন্তর পরিষ্কার থাকে না। ময়লা পড়ে যায়, মনের সাহস কমে যায়, এমন কি, অনেক সময় মনের দুর্বলতা হেতু শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। মনে স্ফুর্তি থাকে না। নেক কাজ ও ইবাদত বন্দেগী হতে মাহ্রূম থাকে। আয়ূ কমে যায়। তাওবা করার তাওফীক হয় না। গোনাহ্ করতে করতে শেষে গোনাহ্র কাজের প্রতি ঘৃণ্যার ভাব থাকে না, বরং ভাল বলে বোধ হতে থাকে। এরূপ হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ্

১. যাদের সাথে পর্দা করা ফরয এবং বিয়ে জায়িয।

তা'আলার নিকট অপমানিত ও লাঞ্চিত হতে হয়। একজনের গোনাহ্র দরুন অন্যান্য লোক, এমন কি, অন্যান্য জীব-জন্তুরও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। পরে তাদের বদ দু'আ ও লা'নতে (অভিশাপে) পড়তে হয়। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হতে তার প্রতি লা'নত হতে থাকে। ফিরিশ্তাগণের দু'আ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। দেশে শস্য, ফসলাদির উৎপন্ন কম হয়। লজ্জা-শরম কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। নানারূপ বিপদ-আপদ বালা-মুসীবতে জড়িয়ে পড়ে। শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। দিল পেরেশান থাকে। মৃত্যুকালে মুখ দিয়ে কালিমা বের হয় না। খোদার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়। পরিশেষে বিনা তাওবায় মারা যায়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

নেক কাজে পার্থিব লাভ

সর্বদা নেক কাজে মশগুল থাকলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। সকল কাজে বরকত হয়ে থাকে। মনের অশান্তি ও কষ্ট দূর হয়। মনের আশা সহজে পূরণ হয়। জীবনে শান্তি লাভ হয়। রীতিমত বৃষ্টিপাত হয়। সকল প্রকার বালা-মুসীবত, বিপদ-আপদ দূর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান এবং সহায় হন। তার হৃদয় মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাকে আদেশ করেন। মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, সকলে তাকে ভালবাসে। কুরআন শরীফ তার রোগ আরোগ্যের উছীলা হয়। টাকা পয়সার দিক দিয়া কোনরূপ ক্ষতি হলে, তা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিস পাওয়া যায়। দিন দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত তার জন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধন-দৌলত বৃদ্ধি পায়। মনে শান্তি বজায় থাকে। তার উছীলায় পরবর্তী বংশধরদের অনেক উপকার হয়। জীবিত অবস্থায় স্বপ্নে বা অন্য কোন অবস্থায় গায়েবী বাশারত (সুসংবাদ) পায়।

মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তা খোশ্‌খবরী (সুসংবাদ) শোনায় এবং ধন্যবাদ দেয়। আয়ূ বৃদ্ধি হয়। দরিদ্রতা এবং অনাহারজনিত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ দূর হয়।

হে খোদা! নিজ রহমতে আমাদেরকে যাবতীয় গোনাহ্‌র কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনার সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুনাফিকের পরিচয়

মূল

জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী

মুনাফিকের পরিচয়

যে ব্যক্তি অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে যবান দ্বারা ইসলাম প্রকাশ করে তাকে মুনাফিক বলে। (আল-মুনজিদ ১০৩৮ পৃঃ)

যুগে যুগে ইসলামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি মুনাফিকদের দ্বারাই হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিক সম্প্রদায়ই সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে। কারণ কাফির সম্প্রদায় যেহেতু প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করতো, তাই তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা সহজ ছিলো। পক্ষান্তরে মুনাফিক সম্প্রদায় মুসলমান পরিচয় দিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলে তাদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো।

মুনাফিকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجدلهم نصيرا

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (সূরা নিসা ১৪৫ আয়াত)

অর্থাৎ ঃ দোযখের সবচেয়ে ভয়াবহ স্থানে মুনাফিকদেরকে রাখা হবে। তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের দ্বীন নিয়ে উপহাস এবং মুসলমানদেরকে সীমাহীন দুর্ভোগে নিক্ষেপ করার কারণে পরকালে সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী কিছু কাজ এমন আছে, যা কেবল মাত্র মুনাফিকদের বৈশিষ্টরূপে গণ্য হয়, কোন মুমিনের জন্য তা শোভনীয় নয়। অথচ অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলমান, খাঁটি মুমিনও নিজের অজান্তে তাতে লিপ্ত হয়ে যায়। এ সম্পর্কেই হাদীছ শরীফের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী সাহেব (মুঃ আঃ) আল্লাহ্পাক আমাদের সবাইকে এ সকল হাদীছ শরীফের উপর যথাযথ আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মিথ্যা ও তার প্রচলিত রূপ

তারিখ ও সময় ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৯১ শুক্রবার, বাদ আসর
স্থান ঃ বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ
গুলশান ইকবাল, করাচী-পাকিস্তান

বয়ানের সার সংক্ষেপ

আজ মিথ্যা আমাদের জীবনে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেরূপভাবে রক্ত আমাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে আছে। চলতে-ফিরতে, উঠতে বসতে যবান থেকে মিথ্যা কথা বের হয়ে যায়। কোন কোন সময় শুধুমাত্র কৌতুক করে, কোন কোন সময় নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, কোন কোন সময় নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। আজকাল মিথ্যা বলাটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা এখন আর মিথ্যা বলাকে না জায়িয ও গোনাহ্র কাজ মনে করে না। বরং অনেকের ধারণা, যে মিথ্যা বললে আমাদের নেকীতে কোন আছর হবে না। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের কাজ বলেছেন। কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:
عن ابي هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد
اخلف واذا اؤتمن خان - وفي رواية وان صام وصلى وزعم انه مسلم

মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন

হযরত আবু হুরাইরাহ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। (অর্থাৎ কোন মুসলমানের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। যদি কারো মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, তাহলে মনে করতে হবে সে মুনাফিক।) আর তাহলো (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। (৩) আর যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে (তার মধ্যে) খিয়ানত করে। কোন কোন বর্ণনায় একথাও আছে যে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং একথার দাবী করে যে, সে মুসলমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান নয়, কেননা মুসলমান হওয়ার জন্য যে সকল মৌলিক গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো সে ছেড়ে বসে আছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম

আল্লাহ্ই জানেন! আমাদের মস্তিষ্কে এ ধারণা কোথা থেকে আসলো যে, ইসলাম কেবলমাত্র নামায-রোযার নাম। নামায আদায় করে নিলাম, রোযা রাখলাম, আর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

মুসলমান হিসেবে অন্য কোন দায়-দায়িত্ব আমার উপরে নেই। কাজেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মিথ্যা ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ কামানো হয়। হালাল হারামের কোন পার্থক্য নেই, যবানের কোন ভরসা নেই, ওয়াদা রক্ষা করা হয় না, আমানতে খিয়ানত করা হচ্ছে। (আর এজন্য উপরোক্ত ভুল ধারণাই দায়ী যে, ইসলাম শুধু নামায রোযার নাম।) সুতরাং কেবল মাত্র নামায রোযাকেই পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করা মারাত্মক ভুল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, চাই সে ব্যক্তি নামায আদায় করুক এবং রোযা রাখুক, তা সত্ত্বেও সে মুসলমান বলার যোগ্য নয়। যদিও তার উপর কাফির হওয়ার ফতোয়াও প্রয়োগ করা যাবে না, কেননা কুফুরির ফতোয়া লাগানো খুব কঠিন ব্যাপার। কাজেই ফতোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার করা যাবে না ঠিক, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি তার সকল কাজ কাফির ও মুনাফিকের মত করছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের নির্দশন তিনটি (১) মিথ্যা বলা (২) ওয়াদা খিলাফ করা। (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা।) (৩) আমানতে খিয়ানত করা। এ তিনটি বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে করেছি। কারণ সাধারণভাবে এ তিন বিষয়ে মানুষের ধারণা খুবই সীমিত। অথচ এ তিনটি বিষয় খুবই বিস্তৃত ও ব্যাপক। আর এজন্যই এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে

জাহিলিয়্যাতের যুগ ও মিথ্যা

মুনাফিকের নির্দশনসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম নিদর্শন হলো, মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথা বলা এমন মারাত্মক হারাম যে, কোন সম্প্রদায় বা কোন জাতির নিকটই এটা বৈধ নয়। এমন কি জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকেরাও মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করতো। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমের বাদশাহের নিকট

ইসলামের দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করলেন, তখন রোমের বাদশাহ্ চিঠি পড়ার পর তার দরবারস্থ লোকদেরকে বললো ঃ যদি আমাদের রাষ্ট্রে এমন কোন লোক থাকে যে তার (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে অবগত আছে, তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। যেন আমি তার নিকট হতে ঐ ব্যক্তির (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনি কেমন ব্যক্তি। ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত আবু সুফিয়ান (রঃ) (যিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) একটি ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে রোমে পৌঁছে ছিলেন। লোকেরা তাকেই বাদশাহ্র দরবারে নিয়ে গেল। দরবারে পৌঁছার পরপরই বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো। প্রথম প্রশ্ন করলো ঃ এ ব্যক্তি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন গোত্রের এবং এটা কিরূপ? আরবে এর প্রসিদ্ধি কেমন? হযরত আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন ঃ বংশতো খুবই সম্ভ্রান্ত। সম্ভ্রান্ত বংশেই তার জন্ম। সমগ্র আরববাসী এ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। বাদশাহ তার জওয়াবকে সমর্থন করে বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছো, যারা আল্লাহ্র নবী তারা শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। অতঃপর বাদশাহ ২য় প্রশ্ন করলেন, তাঁর অনুসারীগণ সাধারণ (নিম্ন শ্রেণীর) মানুষ? না সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশ হলো নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষ। বাদশাহ সত্যায়ন করে বললেন ঃ হ্যাঁ নবীদের প্রাথমিক অনুসারীগণ দুর্বল এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হয়ে থাকে। তারপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, যখন তার সাথে তোমাদের যুদ্ধ হয় তখন তোমরা বিজয়ী হও, না তিনি বিজয়ী হন? সে সময় পর্যন্ত যেহেতু ইসলাম ও কুফরের মাত্র দু'টি যুদ্ধই সংগঠিত হয়েছিলো, বদর ও অহোদ যুদ্ধ। আর অহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা বিপর্যয় ঘটেছিলো। তাই তিনি উত্তরে বললেন ঃ কোন সময় তারা জয়ী হয় আর কখনও আমরা জয়ী হই।

মিথ্যা বলতে পারি না

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর বলতেন, সে সময় যেহেতু আমি কাফির ছিলাম। সেহেতু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমি এমন কোন কথা বলি যার ফলে বাদশাহ্র অন্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাদশাহ্ যত প্রশ্ন করলেন, তার উত্তরে এ ধরনের কোন কথা বলার অবকাশ পেলাম না। কারণ সে যে সকল প্রশ্ন করছিলেন, তার উত্তর দেয়া আমার কর্তব্য ছিলো, আর আমি মিথ্যা বলতে পারি না। আর এজন্যই আমার সকল উত্তরই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে যাচ্ছিলো। মোটকথা জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও মিথ্যা বলাকে সহ্য করতেন না। ইসলাম গ্রহণের পর মিথ্যা বলারতো প্রশ্নই উঠে না। (সহীহ্ বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৭)

মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

আফসোসের বিষয় যে, আজ আমরা এ মিথ্যায় ব্যাপকভাবে লিপ্ত আছি। এমন কি যে সকল লোক হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ পার্থক্য করে শরীয়ত অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেন, তারাও অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যাকে মিথ্যাই মনে করেন না। অথচ তা মিথ্যা, মিথ্যার এ অপব্যাখ্যা করার কারণে তারা ডবল গোনাহে লিপ্ত হচ্ছেন। (১) মিথ্যা বলার গোনাহ্ (২) গোনাহ্কে গোনাহ্ মনে না করার গোনাহ্। আমি একজন লোক সম্পর্কে জানি, যিনি পাক্কা নামাযী, রোযাদার, যিকর-আযকারের পাবন্দ, একান্ত নেককার। বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্কও রাখেন। তিনি সে সময় বিদেশে চাকুরী করতেন। একবার তিনি যখন দেশে আসলেন, তখন আমার সাথেও সাক্ষাৎ করতে আসলেন। সে সময় আমি তাকে প্রশ্ন করলাম কবে যাচ্ছেন? তিনি উত্তর করলেন ঃ আমি আরো আট/দশ দিন থাকবো। আমার ছুটিতো শেষ হয়ে গেছে, গতকালই আমি অতিরিক্ত ছুটি নেওয়ার জন্য একটি মেডিক্যাল

সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের কথা এমনভাবে বললেন, যেন এটা একটা স্বাভাবিক কথা, এতে কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি বললাম মেডিক্যাল সার্টিফিকেট কেন পাঠালেন? তিনি উত্তর করলেন অতিরিক্ত ছুটি নেওয়ার জন্য। কারণ আমি যদি এমনিই ছুটি চাইতাম, তাহলে ছুটি পেতাম না, ঐ সার্টিফিকেটের বদৌলতে ছুটি মিলে যাবে। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ঐ সার্টিফিকেটে আপনি কি লিখেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি লিখেছি, যে এত বেশি অসুস্থ যে এ অবস্থায় সফর করা সম্ভব নয়।

দ্বীন কি শুধু নামায-রোযার নাম?

(উপরোক্ত আলোচনার পর) আমি তাকে বললাম ঃ দ্বীনদারী কি শুধুমাত্র নামায রোযা আর যিক্‌র-আযকারের নাম? বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আপনার সম্পর্ক তা সত্ত্বেও আপনি এ মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠালেন! যেহেতু তিনি সৎ লোক ছিলেন, কাজেই পরিস্কার স্বীকার করলেন, আমি প্রথমবার আপনার মুখ থেকে শুনলাম এটা কোন অন্যায় কাজ। আমি বললাম ঃ মিথ্যা আর কাকে বলে। তিনি বললেন ঃ তাহলে অতিরিক্ত ছুটি নেওয়ার পন্থা কি? আমি বললাম ঃ যে কয়দিনের ছুটি পাওনা শুধুমাত্র সে কয়দিনের ছুটি নিন, এর চেয়েও যদি অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হয়, তাহলে বিনা বেতনের ছুটি ভোগ করুন। কিন্তু এ মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠানোর তো কোন বৈধতা নেই।

আজকাল মানুষেরা মনে করে মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বানানো, এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ধর্ম শুধু যিক্‌র-আযকার আর নামায রোযার নাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলে চলছে, কিন্তু তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

মিথ্যা সুপারিশ করা

আমি একবার সৌদী আরব সফর কালে যখন জিদ্দায় ছিলাম তখন একজন শিক্ষিত, বিচক্ষণ, দ্বীনদার মুরুব্বীর একখানা সুপারিশমূলক চিঠি আমার নিকট পৌছলো। তিনি উক্ত চিঠিতে লিখেছেন ঃ পত্রবাহক ভারতের বাসিন্দা, এখন পাকিস্তান যেতে চায়, সুতরাং আপনি পাকিস্তান হাই কমিশনে এর জন্য সুপারিশ করে, একে একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট বের করে দিন। আপনাকে একথা বললেই চলবে যে, এ পাকিস্তানের নাগরিক, এখানে (সৌদী আরবে) তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। কারণ এ ব্যক্তি নিজেও পাকিস্তান হাই কমিশনে দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে যে, তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। কাজেই আপনি একটু সুপারিশ করলেই এর কাজ হয়ে যাবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যে পবিত্র মাটিতে ওমরা পালন করা হচ্ছে, হজ্ব আদায় করা হচ্ছে, তাওয়াফ ও সায়ী করা হচ্ছে, সাথে সাথে এ জালিয়াতী এবং ধোঁকাবাজীও চলছে। অবস্থা এমন যেন এটা কোন ধর্মের অংশই নয়। দ্বীন ও শরীয়তের সাথে যেন এর কোন সম্পর্কই নেই। মনে হয় লোকেরা এরূপ ধারণা করে রেখেছে যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক পরিকল্পিতভাবে, মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করে বলা হয়, তাহলেই তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে, অন্যথায় মিথ্যা গণ্য হবে না। কাজেই ডাক্তার দিয়ে মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বানিয়ে নেওয়া, কাউকে দিয়ে মিথ্যা সুপারিশ করানো অথবা মিথ্যা মামলা দায়ের করা। এগুলো কোন মিথ্যাই নয়। অথচ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ ঃ যবান (মুখ) থেকে যে শব্দ বের হয়, তা তোমাদের আমলনামায় রেকর্ড করা হচ্ছে।

শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলো না

একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক মহিলা একটি বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু কিছুতেই

ঐ বাচ্চা মহিলার কাছে আসছিল না। তখন ঐ মহিলা বাচ্চাটিকে কাছে পাওয়ার জন্য বললো ঃ বেটা এদিকে এসো, তাহলে আমি তোমাকে একটি জিনিষ দিবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথা শুনে বললেন ঃ সত্যিই কি তোমার কোন জিনিষ দেওয়ার ইচ্ছে আছে? নাকি এমনিই একে কাছে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বলছো? তখন উক্ত মহিলা উত্তর করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে খেজুর দেওয়ার ইচ্ছে করেছি। যখন সে আমার কাছে আসবে আমি তাকে খেজুর দিবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি খেজুর দেওয়ার নিয়ত না থাকতো, তুমি তাকে ভুলিয়ে কাছে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলতে যে, আমি তোমাকে খেজুর দিবো, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা (কথা বলার গোনাহ্) লিখে দেওয়া হতো। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নম্বর ৪৯৯১)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীছ থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলো না। এবং শিশুদের সাথেও প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) ভঙ্গ করো না। কারণ এর ফলে শৈশব থেকেই তার অন্তর হতে মিথ্যার জঘন্যতা উঠে যাবে।

ঠাট্টা বা কৌতুক করেও মিথ্যা বলোনা

আমরাতো অনেক সময় হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুক করেও মিথ্যা কথা বলে ফেলি। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুক বা হাস্যোচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ আফছোছ! ঐ ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র মানুষদের হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৯৯০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৌতুক

কৌতুক এবং চিত্তবিনোদনমূলক কথাবার্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলতেন, কিন্তু তিনি কখনো মিথ্যা বা বাস্তবতা

বর্জিত কোন কৌতুক করেননি। তাঁর কৌতুকের ঘটনা হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক বৃদ্ধা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন বৃদ্ধা বেহেশ্তে যাবে না। একথা শুনে ঐ বৃদ্ধা কাঁদতে শুরু করলো, যে এ তো খুব মারাত্মক কথা যে কোন বৃদ্ধা বেহেশ্তে যাবে না! অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কোন মহিলা বৃদ্ধা অবস্থায় বেহেশ্তে যাবে না বরং সকল মহিলাই যুবতী হয়ে বেহেশ্তে যাবে।

ফায়দা ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কৌতুকের কোন কিছুই মিথ্যা বা বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল না। (শামায়েলে তিরমিজী)

কৌতুকের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

একজন গ্রাম্য সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে, দরখাস্ত করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি উট দান করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দিবো। উক্ত সাহাবী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করবো, আমার তো সাওয়ার হওয়ার জন্য উটের প্রয়োজন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকে যে কোন উটই দেওয়া হোক না কেন তা কোন না কোন উটের বাচ্চাই হবে।

ফায়দা ঃ এ ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৌতুক। তিনি কৌতুকের মধ্যেও বাস্তবের পরিপন্থি কোন মিথ্যা কথা বলেননি। কৌতুকের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কোন অসর্তক মুর্হুতে যবান থেকে কোন মিথ্যা কথা বের হয়ে না যায়। আজ কালতো আমাদের সমাজে হাজারো মিথ্যা কিস্সা-কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

এগুলোকে আমরা মিথ্যা বলে জানা সত্যেও খোশ গল্পে তা নির্দ্বিধায় বলে বেড়াই। এসবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন। (শামায়েলে তিরমিযি)

মিথ্যা চারিত্রিক সার্টিফিকেট

আজকাল এটা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, যথেষ্ট দ্বীনদার, শিক্ষিত লোকজনও এতে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো নিজে মিথ্যা সার্টিফিকেট বের করে অথবা অন্যকে বের করে দেয়। যেমন কারো চারিত্রিক সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হলো। এখন সে কাউকে ধরে তা বানিয়ে নেয়। আর সার্টিফিকেট দাতা উক্ত সার্টিফিকেটে লিখে দেয় যে, আমি এ ব্যক্তিকে পাঁচ বৎসর যাবত চিনি, এ ব্যক্তি খুবই ভাল মানুষ, এর চরিত্র এবং কর্মক্ষমতা অনেক উন্নত। অথচ একে সে কোন দিন দেখেই নি। তা সত্ত্বেও সার্টিফিকেট দাতা এবং সার্টিফিকেট গ্রহীতা কারো ধারণায়ও আসে না যে তারা কোনরূপ অন্যায় কাজ করছে। সার্টিফিকেট দাতা চিন্তা করে এর প্রয়োজন ছিলো আমি তা মিটিয়েছি, কাজেই আমি অনেক বড় নেক কাজ করেছি। এতে আমি বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হবো। বাস্তব ঘটনা হলো যদি সার্টিফিকেট দাতা ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে তার জন্য এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জায়িয নয়, হারাম। অপর দিকে সার্টিফিকেট গ্রহীতার জন্যও এমন লোক (যে তাকে জানে না) থেকে সার্টিফিকেট নেওয়াও জায়িয নয়। মোট কথা এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ে গোনাহ্গার হবে।

কারো চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার দু'টি পদ্ধতি

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য আরেকজন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললো ঃ হযরত সে তো খুবই ভাল লোক। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যে তার সম্পর্কে বলছো, যে সে খুব উন্নত চরিত্র এবং কীর্তির অধিকারী, আচ্ছা তুমি কি তার সাথে কখনো লেন-দেন করে দেখেছো? সে ব্যক্তি উত্তর দিলো না আমি তার সাথে কোন সময় লেন-দেন করিনি। অতঃপর হযরত ওমর প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা তাহলে তুমি কি তার সাথে কখনো সফর করেছো? সে বললো না তার সাথে কখনও কোন সফরও করিনি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন তাহলে তুমি কি করে বুঝলে যে সে চরিত্র এবং কর্মের দিক দিয়ে ভাল মানুষ। কারণ মানুষের আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে তো সে সময় অবগত হওয়া যায়, যখন তার সাথে কোন প্রকার লেন-দেন করা হয়। লেন-দেনের মধ্যে যদি তাকে খাঁটি পাওয়া যায়, তাহলে সে খাঁটি। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার অপর পদ্ধতি হলো, যে তার সাথে একত্রে সফর করা। কারণ সফরের সময় মানুষ খোলস মুক্ত হয়ে তার আসল চেহারা নিয়ে সামনে আসে। তার চরিত্র, তার আচার-ব্যবহার, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা, তার মন-মানসিকতা, তার আন্তরিক আগ্রহ-অনাগ্রহ, সব কিছু সফরের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং যদি তুমি তার সাথে লেন-দেন অথবা সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকো, তাহলে তো একথা বলা ঠিক ছিলো যে, এ ব্যক্তি খুবই ভাল মানুষ। কিন্তু যখন তুমি তার সাথে কোন প্রকার লেন-দেন কিংবা সফর কিছুই করনি, যার ফলে তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানো না, কাজেই তোমার উচিৎ তার সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করা, না তাকে ভাল বলবে, না মন্দ বলবে। যদি কোন লোক তার সম্পর্কে তোমার নিকট জানতে চায় তাহলে তুমি তাকে সে পরিমাণই বলো, যা তুমি জানো যেমন বলে দাও যে, আমি তো মসজিদে তাকে নামায পড়তে দেখি, এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই।

সার্টিফিকেট এক প্রকারের সাক্ষ্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ ঃ তবে যারা সত্য স্বীকার করতো ও বিশ্বাস করতো।

মনে রাখা দরকার যে, এ সার্টিফিকেট এবং এ সত্যায়নপত্র শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধরনের সাক্ষ্য প্রদান। কাজেই যে ব্যক্তি এ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করছে সে প্রকৃতপক্ষে স্বাক্ষ্যদান করছে। অথচ উপরোক্ত আয়াতের আলোকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, সাক্ষ্য দেওয়া তখনই জায়িয হবে যখন সাক্ষী ঐ ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করে একীনের সাথে একথা বলতে পারবে যে বাস্তবেও এটা এরূপই। তখনই মানুষ সাক্ষী দিতে পারবে। এছাড়া আর সাক্ষ্য দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। আজকাল কারো সম্পর্কে ভালোমত না জেনেই চারিত্রিক সার্টিফিকেট জারি করা হয়। এর ফলে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়ার গোনাহে গোনাহ্গার হবে। আর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এমন মারাত্মক গোনাহ্, যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে শির্কের গোনাহের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শির্কের সমতুল্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের বলবো বড় বড় গোনাহ্ কী কী? সাহবায়ে কিরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন ঃ তখন তিনি বললেন ঃ বড় বড় গোনাহ্ হলো আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে শরীক করা। পিতা-মাতার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করা। একথা বলা পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। একথাটি তিনবার বলেছেন। (মুসলিম শরীফ, ঈমান অধ্যায় হাদীস নং ১৪৩)

এখন এর (মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের) ভয়াবহতা অনুধাবন করুন। একদিকে তো একে শির্কের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন, অন্য দিকে একথাটি তিন তিন বার এভাবে বলেছেন, যে আগে তো তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। একথা বর্ণনা করার সময় সোজা হয়ে

বসেছেন। স্বয়ং পবিত্র কুরআনেও একে শির্কের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (سورة الحج ٣)

অর্থাৎ ঃ তোমরা মূর্তি পূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকো। এর দ্বারা বুঝে আসে মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কত বড় ভয়াবহ ব্যাপার।

সার্টিফিকেট দাতা গোনাহ্গার হবে

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, মিথ্যা কথা বলার চেয়ে মারাত্মক এবং ভয়াবহ। কারণ এতে কয়েকটি গোনাহ্র সম্মিলন হয়। যেমন, (১) মিথ্যা কথা বলার গোনাহ্। (২) অন্যকে বিভ্রান্ত করার গোনাহ্। কেননা, আপনি এ মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। সুতরাং এ মিথ্যা সার্টিফিকেট যখন অন্যের নিকট পৌঁছবে, সে তখন মনে করবে এ লোক তো খুবই ভাল মানুষ এবং তাকে ভাল মনে করে যখন সে তার সাথে কোন লেন-দেন বা কাজ-কারবার করবে এবং এর ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন এর দায়-দায়িত্ব আপনার উপরও বর্তাবে। অথবা মনে করুন আপনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন। যার ফলশ্রুতিতে আদালত কারো বিপক্ষে রায় দিলো, এই রায়ের ফলে তার যা কিছু ক্ষতি হবে এর সবই আপনার গর্দানে পতিত হবে। অতএব মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ মিথ্যা সাক্ষ্য (সার্টিফিকেট) প্রদানের গোনাহ্ কোন সাধারণ গোনাহ্ নয়।

আদালত মিথ্যার বেসাতী

আজকাল তো আদালতের অবস্থা এমন হয়েছে যে, অন্য কোন জায়গায় কেউ মিথ্যা বলুক আর নাই বলুক, কিন্তু আদালতে মিথ্যা অবশ্যই বলবে। কোন কোন লোকতো কথা প্রসঙ্গে এমনও বলে থাকে যে, ভাই এখানে সত্য কথা বলতে অসুবিধা কি? এটাতো আদালত

নয় যে মিথ্যা বলতেই হবে। অর্থাৎ মিথ্যা বলার জায়গা হলো আদালত। সেখানে গিয়েই মিথ্যা বলো। এখানে যখন আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তখন সত্যি কথা বলো। অথচ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্‌কের সমপর্যায়ের গোনাহ্ বলেছেন। তাছাড়া এটা কয়েকটি গোনাহের সমষ্টিও বটে।

মোটকথা না জেনে যত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং প্রদানকারী একথা জেনে সার্টিফিকেট জারী করে যে, এটা মিথ্যা সার্টিফিকেট। যেমন ডাক্তার একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো। অথবা পাশ না করা সত্ত্বেও কাউকে পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো। অথবা কারো চরিত্র সম্পর্কে না জেনে তাকে উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট প্রদান করলো। এসবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

মাদ্রাসার জন্য সত্যায়ন পত্র প্রদান সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত

আমার নিকট অনেক লোক মাদ্রাসার সত্যায়ন করানোর জন্য এসে থাকেন। এতে একথার সত্যায়ন করতে হয় যে, বাস্তবিকই এ মাদ্রাসা আছে, এতে এ শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্র সংখ্যা এত ইত্যাদি। এ সত্যায়ন পত্রের উদ্দেশ্য হলো মানুষেরা যেন আশ্বস্ত হয়ে ঐ মাদ্রাসায় দান-খায়রাত করে। এমতাবস্থায় এ সত্যায়ন পত্র লিখতে মনে চায়, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আমার পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (রহঃ) কে দেখেছি যে, যখন তার নিকট কেউ এ ধরনের সত্যায়ন পত্রের জন্য আসতো, তখন তিনি একথা বলে অক্ষমতা পেশ করতেন, ভাই এ সত্যায়ন পত্রও এক ধরনের সাক্ষ্য দেওয়া। কাজেই মাদ্রাসার অবস্থা না জেনে আমি সত্যায়ন পত্র লিখতে পারবো না। কারণ এ অবস্থায় এটা মিথ্যা সাক্ষ্যরূপে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোন মাদ্রাসা সম্পর্কে জানা থাকতো তাহলে অতটুকুই লিখতেন, যতটুকু তিনি জানতেন।

বইতে অভিমত লিখা, সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত

অনেকেই তার বইয়ের ব্যাপারে অভিমত লিখানোর জন্য এসে বলে, আমি এ বই লিখেছি, আপনি একটি অভিমত লিখে দিন যে, এটা উত্তম ও নির্ভরযোগ্য বই। অথচ বই আদ্যোপান্ত না পড়ে কিভাবে লিখবে এটা ভাল কি খারাপ? অনেকেই একথা মনে করে যে আমি দু'কলম লিখে দিলে এর উপকার হবে, লিখলে ক্ষতি কি? তাদের মনে রাখা দরকার যে, কোন বইতে অভিমত লিখার অর্থ হলো, ঐ বই সম্পর্কে ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া। এক্ষেত্রে না জেনে অভিমত লিখাকে মানুষ কোন অন্যায়ই মনে করে না। বরং অনেকে বলে থাকে যে ভাই! আমি সামান্য একটি কাজ নিয়ে অমুকের নিকট গিয়েছিলাম, সে যদি দু'কলম লিখে দিতো, তাহলে তার কি ক্ষতি হতো? একটি সার্টিফিকেট লিখে দিলে কি এমন লোকসান হতো। লোকটি বড় বজ্জাত কাউকে একটি সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেয় না।

ভাই আসল কথা হলো, আল্লাহ্ পাকের দরবারে এক একটি শব্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। যে শব্দ আমরা মুখে উচ্চারণ করছি। যে শব্দ আমরা কলম দ্বারা লিখছি, তার সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের নিকট রেকর্ড হচ্ছে। এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে অমুক শব্দ তুমি বলেছিলে, কি জন্য বলেছিলে? জেনে বুঝে বলেছিলে? না কি ভুল বশত বলেছিলে?

মিথ্যা হতে বেঁচে থাকুন

বর্তমানে আমাদের সমাজে মিথ্যা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে। এ রোগে যথেষ্ট শিক্ষিত, দ্বীনদার, নামাযী, যিক্‌র-আয্‌কারে অভ্যস্ত, বুযুর্গদের সংস্রব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গও লিপ্ত রয়েছে। এ সকল লোকজনও এ মিথ্যাকে এবং মিথ্যা সার্টিফিকেট জারী করাকে নাজায়িয ও খারাপ মনে করে না। অথচ হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকের নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেনঃ

[অর্থাৎ যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে।]

এর মধ্যে এ সকল কথাও অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বিরত থাকা এবং সতর্কতা অবলম্বন করাও দ্বীনদারির অংশ। এ সকল বিষয়কে দ্বীন (ধর্ম) হতে বর্হিভূত মনে করা মারাত্মক গোমরাহী। কাজেই এসকল বিষয় হতেও বেঁচে থাকা চাই।

যে সকল ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি আছে

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্র এমনও আছে, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন কারো জীবনের উপর যদি এমন হুমকী সৃষ্টি হয় যে, মিথ্যা বলা ছাড়া প্রাণ বাঁচানোর আর কোন উপায় না থাকে। অথবা যদি প্রাণান্তকর অত্যাচার বা কষ্টের আশংকা হয় যে, যদি মিথ্যা না বলে তাহলে এমন অত্যাচারের শিকার হবে যে তা সহ্য করার মত নয়। এ সকল ক্ষেত্রে শরীয়ত মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছে, অবশ্য এক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান হলো, প্রথমেই সরাসরি মিথ্যা না বলে কথাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবে যাতে সাময়িক বিপদ দূরীভূত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে "তা'রীয" ও "তাওরিয়্যাহ্" বলে। এর অর্থ হলো, এমন শব্দ বলবে যার বাহ্যিক এক অর্থ কিন্তু অন্তরে ভিন্ন অর্থে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমন গোলমেলে (দুর্বোধ্য) শব্দ ব্যবহার করবে যাতে সরাসরি মিথ্যা বলতে না হয়।

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ) এর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার ঘটনা

হিজরতের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন মক্কার কাফির সম্প্রদায় তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য চারিদিকে নিজেদের গুপ্তচরদের ছড়িয়ে দিয়ে, এ ঘোষণা দেয় যে ব্যক্তি হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে আনবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সে সময় মক্কার

সকল কাফির মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে খুবই ব্যস্ত ছিলো। রাস্তায় হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ) এর পরিচিত এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো, যে শুধু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কে চিনতো, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনতো না। ঐ লোক হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ) কে প্রশ্ন করলো ঃ তোমার সাথে কে? হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ) সে সময় চাচ্ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কেউ যেন জানতে না পারে। কারণ এতে করে শত্রু পক্ষ পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছলে ক্ষতির প্রবল আশংকা আছে। যদি তিনি সঠিক উত্তর দেন তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উপর হুমকী আসে। অপরদিকে মিথ্যাও বলতে পারছেন না। এ ধরনের বিপদের সময় স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই বান্দাকে রাস্তা দেখান। হযরত সিদ্দীকে আকবার ঐ ব্যক্তির উত্তরে বললেন ঃ

هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ

অর্থাৎ ঃ ইনি আমার পথ প্রদর্শক। আমাকে রাস্তা দেখান। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উত্তরে এমন শব্দ বললেন যা শুনে ঐ ব্যক্তি মনে করলো, সাধারণত ঃ মরুভূমির সফরকালে লোকেরা যেমন রাস্তা দেখানোর জন্য অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক সাথে রাখে, তদ্রূপ ইনিও কোন রাহনুমা (পথ প্রদর্শক) হবেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এর উদ্দেশ্য ছিলো ধর্মের পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির রাস্তা এবং জান্নাতের রাস্তা দেখান।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এরূপ মারাত্মক সময়েও তিনি সরাসরি মিথ্যা বলাকে সযত্নে পরিহার করে এমন শব্দ ব্যবহার করলেন যাতে প্রয়োজনও মিটে গেল, অথচ মিথ্যাও বলতে হলো না। (বোখারী শরীফ, হাদী, নম্বর ৩৯১১)

যাদেরকে আল্লাহ্ পাক এমন পবিত্র হৃদয় দান করেছেন যে তারা মনস্থির করেছে, যে জীবনে কখনও বাস্তবতার পরিপন্থি এবং মিথ্যা

কোন শব্দ মুখ থেকে বের করবেন না। তাদেরকে এ সকল বিপদের সময় গায়েবী মদদ করে থাকেন।

হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) যিনি ১৮৫৭ সনের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। এ ছাড়া হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) সহ অন্যান্য আকাবিরে দেওবন্দও এ জিহাদে সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছেন।

এ পবিত্র জিহাদে যে সকল মনিষী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা তাদেরকে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো হলো। প্রতিটি মহল্লায় তথাকথিত আদালত কায়িম করে, ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হলো। যেখানেই যার উপর সন্দেহ হতো তাকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাযির করা হতো। আর তখন সে বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে হুকুম দিয়ে দিতো যে একে ফাঁসি দিয়ে দাও। সাথে সাথে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। সে সময় মিরাঠের এ ধরনের এক আদালতে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হলো। ফলে আদালতে হাজির হতে হলো। যখন হযরত গাংগুহী (রহঃ) আদালতে পৌঁছলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনার নিকট কোন অস্ত্র আছে কিনা? [কারণ তার নামে এ রিপোর্ট করা হয়েছিল যে বন্দুক আছে। আর প্রকৃত পক্ষেও হযরত গাংগুহী (রহঃ) এর নিকট বন্দুক ছিলো] যে সময় হযরতকে উপরোক্ত প্রশ্ন করা হলো, তখন তাঁর হাতে তাছবিহ্ ছিলো। সুতরাং তিনি তাছবিহ্ উঁচিয়ে দেখালেন এবং বললেন ঃ এই আমাদের অস্ত্র। তিনি একথা বলেননি যে আমার নিকট অস্ত্র নেই। কারণ তাহলে তা মিথ্যা হয়ে যেত। হযরতের বলার এবং তাছবিহ্ দেখানোর ঢংও এমন ছিলো যে, একেবারে সাদাসিধে দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ মনে হচ্ছিল।

এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্যও খুবই বিস্ময়করভাবে করে থাকেন। হযরত গাংগুহীর (রহঃ) সাওয়াল জওয়াব চলছিলো ইত্যবসরে এক গ্রাম্য ব্যক্তি সেখানে আগমন করলো, যখন সে দেখলো যে হযরতকে এভাবে সাওয়াল জওয়াব করা হচ্ছে, তখন সে বলে উঠলো ঃ আরে! একে কোথা হতে ধরে এনেছো, এতো আমাদের মহল্লার মসজিদের মুয়াজ্জিন। এভাবে হযরত গাংগুহী (রহঃ) কে আল্লাহ্ পাক ঐ বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন।

হযরত নানুতুবী (রহঃ) এর ঘটনা

সে সময় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাছেম নানুতুবী (রহঃ) এর বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিলো। পুলিশ চারদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এ সময় হযরত নানুতুবী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দ সংলগ্ন ছাত্তাহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ সেখানেই পৌঁছে গেল। মসজিদের ভিতর হযরত একাই ছিলেন। যারা হযরত নানুতুবী (রহঃ) কে দেখেনি, তারা নাম শুনে মনে করতো এত বড় আলিম, নিশ্চয়ই শানদার পোশাক তথা জুব্বা কুব্বা ইত্যাদি পরিহিত হবেন। কিন্তু তিনিতো এসব কিছুই পরতেন না। তিনি সর্বদা একটি সাধারণ লুঙ্গি এবং একটি সাধারণ কোর্তা পরিধান করতেন। পুলিশ মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে হযরত নানুতুবী (রহঃ)কে দেখে মনে করলো, এ বোধ হয় মসজিদের কোন খাদিম হবে। তাই প্রশ্ন করলো ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ কাছেম সাহেব কোথায় আছে? হযরত নানুতুবী (রহঃ) সাথে সাথে নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখান থেকে এক কদম পিছিয়ে গিয়ে বললেন ঃ সামান্য আগেও এখানে ছিলো। তিনি এ উত্তর দ্বারা একথা বুঝাতে চাইলেন যে এখন এখানে নেই। কিন্তু এ কঠিন বিপদের মুহুর্তেও তিনি যবান থেকে মিথ্যা কথা বললেন না যে এখানে নেই। সুতরাং পুলিশ ফিরে চলে গেল।

আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বান্দাগণ, এমন কঠিন বিপদের মুহূর্ত যখন জীবন-মরনের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখনও এদিকে গুরুত্বের সাথে খেয়াল

রাখেন, যেন যবান দিয়ে কোন অসত্য কথা বের না হয়। কঠিন থেকে কঠিন বিপদের মুহূর্তেও তাওরিয়া তথা গোলমেলে কথা বলে সাময়িক কাজ চালিয়ে থাকেন। অবশ্য যদি জীবন নাশের ভয় থাকে অথবা সীমাহীন অত্যাচার (যা সহ্যের ক্ষমতা নেই) এর আশংকা হয়। আর তাওরিয়া তথা গোলমেলে কথায় কাজ না হয়, তাহলে এক্ষেত্রে শরীয়ত মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে অনুমতিকে প্রয়োজন অপ্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে এত অধিকহারে প্রয়োগ করা, যেমনটি আজ কাল হচ্ছে, একান্তই হারাম। কারণ এতে মিথ্যা সাক্ষ্যের গোনাহ্ হয়। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এ থেকে হিফাযত করুন। আমীন

শিশুদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণ্যা সৃষ্টি করুন

শিশুদের অন্তরে শৈশব থেকেই মিথ্যার প্রতি ঘৃণ্যা সৃষ্টি করা উচিত। নিজেও সর্বদা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হোন। এরূপভাবে কথা বলুন যাতে তাদের কঁচি হৃদয়ের মাঝে মিথ্যার স্থান না হয় এবং মিথ্যার প্রতি যেন ঘৃণ্যার সৃষ্টি হয়। সত্যের প্রতি যেন তারা আগ্রহশীল হয়। সত্যের মুহাব্বাত যেন তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়। শিশুদের সম্মুখে কখনো কোন মিথ্যা কথা না বলা উচিত। কারণ শিশু যখন দেখবে যে তার পিতা মিথ্যা বলছে, মা মিথ্যা বলছে, তখন শিশুর কঁচি হৃদয়ে মিথ্যার প্রতি ঘৃণ্যাবোধ বাকি থাবকে না এবং সে ভাবতে শুরু করবে যে মিথ্যা কথা বলাটাতো দৈনন্দিন প্রয়োজনের একটা অংশ। কাজেই শৈশব থেকেই শিশুদেরকে অভ্যস্ত করে তুলবে যে, যবান থেকে যে কথা বের হয় সেটা যেন ঠিক থাকে, তার যেন কোন হেরফের না হয়। শিশুর কথার মধ্যে যেন কোন প্রকার মিথ্যার লেশ মাত্র না থাকে। তার কোন কথা বাস্তবতা বিরোধী না হয়। কারণ নবুওতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো ছিদ্দীকের। আর ছিদ্দীক বলা হয় সবচেয়ে বড় সত্যবাদীকে। অর্থাৎ যার কথার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই।

কর্মেও মিথ্যার প্রকাশ ঘটে

যবান দ্বারা যেমন মিথ্যা কথা বলা হয়, তদ্রুপ কর্মেও মিথ্যার প্রকাশ ঘটে থাকে। কারণ কোন কোন সময় মানুষ এমন আ'মল করে থাকে যা বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা হয়ে থাকে। যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি কর্মে নিজেকে এমন জিনিষের অধিকারী রূপে প্রকাশ করে, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে সে মিথ্যার পোশাক পরিধানকারী হবে। এর উদ্দেশ্য হলো যে, কোন লোক যদি নিজের কোন কর্ম দ্বারা নিজকে এরূপ প্রকাশ করে, যা প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে নেই তাহলে সে গোনাহ্গার হবে। যেমন কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য না হওয়া সত্যেও নিজ কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, জীবন যাপনের পদ্ধতি দ্বারা একথা বুঝায় যে, সে খুব ধনী, এও এক প্রকার আ'মলী মিথ্যা। অথবা এর বিপরিত একজন মোটামোটি বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজ কর্মে এমনভাব করে যে, লোকে তাকে দেখলে মনে করে এর নিকট কিছুই নেই, এ একান্তই নিঃস্ব, দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে সে দরিদ্র নয় বরং ধনী, একেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আ'মলী মিথ্যা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এমন কোন কাজ যার দ্বারা মানুষের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়, তা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লিখা

অনেক লোক এমন আছে যারা নিজের নামের সাথে এমন উপাধী বা পদবী ব্যবহার করে যা বাস্তবের পরিপন্থি। প্রচলন হয়ে যাওয়ার কারণে কোন প্রকার সংবাদ না নিয়ে তাহ্কিক না করেই লিখতে শুরু করে দেয়। যেমন অনেকেই নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লিখে থাকে। অথচ বাস্তবে সে সাইয়্যিদ নয়। কারণ সাইয়্যিদ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে পিতার দিক থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বংশধর হয়। কোন কোন লোক মায়ের দিক থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ লিখে থাকে। এটাও ভুল। কাজেই যতক্ষণ না সাইয়্যিদ হওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাইয়্যিদ লিখা জায়িয হবে না। অবশ্য তাহ্কিকের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে, যে যদি ঐ খান্দানে একথা প্রসিদ্ধ থাকে যে এ গোত্র সাইয়্যিদ, তাহলে সাইয়্যিদ লিখাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি সাইয়্যিদ হওয়া সম্পর্কে জানা না যায় এবং এর কোন প্রমাণও না থাকে তা সত্ত্বেও সাইয়্যিদ লিখে, তাহলে এতেও মিথ্যা বলার গোনাহ্ হবে।

মাওলানা ও প্রফেসর শব্দের ব্যবহার

কোন কোন লোক প্রফেসর না হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামের সাথে প্রফেসর লিখতে আরম্ভ করে। এতে মিথ্যা বলার গোনাহ্ হবে। কারণ প্রফেসর একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ যা বিশেষ লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন আলিম বা মাওলানা শব্দ ঐ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যে নিয়মিত কোন যোগ্য উস্তাযের নিকট পড়ে, দরসে নিজামীর সিলেবাস সমাপ্ত করে, কোন মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হয়েছে। অথচ আজকাল এমন অনেক লোক আছে যারা নিয়মিত পড়াশোনা করেনি, কোন মাদ্রাসা থেকে ফারিগও হয়নি, তা সত্ত্বেও নিজ নামের সাথে মাওলানা লিখে থাকে। যা বাস্তবতা বিরোধী এবং একান্ত মিথ্যা। কিন্তু আমরা এ সকল বিষয়কে মিথ্যাই মনে করি না এবং এ সকল বিষয়ও যে গোনাহের কাজ তাও মনে করি না। আসল অবস্থা হলো এসবই মিথ্যা এবং মারাত্মক ধরনের কবিরাহ্ গোনাহ্। কাজেই এ সকল জিনিষ থেকে সযত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ সকল গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও তার প্রচলিত রূপ

তারিখ ঃ ২রা ডিসেম্বর ১৯৯১ ঈসায়ী
স্থান ঃ বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ
গুলশান ইকবাল, করাচী, পাকিস্তান

বয়ানের সার সংক্ষেপ

ওয়াদা খিলাফির অনেকরূপ এমনও আছে, যাকে আমরা ওয়াদা খিলাফির লিষ্ট থেকে বের করে দিয়েছি। সুতরাং যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, যে ওয়াদা খিলাফ করা ভাল না খারাপ? তাহলে সে অবশ্যই বলবে যে, ওয়াদা খিলাফ করা তো খুবই খারাপ কাজ। মারাত্মক গোনাহ্র কাজ। কিন্তু বাস্তব জীবনে যখন সময় আসে, তখনই ওয়াদা খিলাফ করা হয়। অথচ সে বুঝতেও পারে না যে, সে ওয়াদা খিলাফ করছে। কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ওয়াদা খিলাফ করা মুনাফিকের কাজ।

نَحمدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم   اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَفِى رِوَايَةٍ اِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ

مُسْلِمٌ

যথা সম্ভব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত

গত জুম্‌আয় এ হাদীছে বর্ণিত মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন হতে একটি অর্থাৎ মিথ্যা (ও তার প্রচলিত রূপ) সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ্‌ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীছে মুনাফিকের দ্বিতীয় যে নিদর্শন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, তাহলো,

অর্থাৎ ঃ যখন সে কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) দেয়, তখন তা রক্ষা করে না। মুমিনের কাজ হলো যখন সে কোন ওয়াদা করবে তখন তা পূরণ করবে। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, যখন কোন ব্যক্তি কোন ওয়াদা করবে, তখন ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে যদি কোন মারাত্মক উযর কিংবা কোন শক্ত বাঁধা দেখা দেয়, যার ফলে ওয়াদা পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, এ সকল বাধা ও অসুবিধার কারণে এখন আর আমি ওয়াদাপূরণ করতে পারছি না। এজন্য আমি উক্ত ওয়াদা বাতিল করছি। যেমন কেউ ওয়াদা করলো যে, আমি তোমাকে অমুক তারিখে এক হাজার টাকা দিবো। পরে দেখা গেল যে ওয়াদাকারীর নিকট কোন টাকা নেই, শেষ হয়ে গেছে। এখন সে এমন পজিশনে নেই যে

তাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাকে এক হাজার টাকা দিতে পারে। তাহলে এ অবস্থায় কর্তব্য হলো, প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিবে যে, আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু এখন আমার সে পজিশন নেই যে, আমি ওয়াদা রক্ষা করবো। কিন্তু যতক্ষণ ওয়াদা পূরণ করার মত পজিশন থাকে এবং শরয়ী কোন বাঁধাও না থাকে সে সময় পর্যন্ত ওয়াদা পূরণ করা একান্ত জরুরী।

বাগ্‌দান করা একটি ওয়াদা

যেমন কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কথা দিলো, তাহলে এটাও এক প্রকার ওয়াদা, কাজেই যথা সম্ভব তা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন, কথা দেওয়ার পরে জানা গেল যে, এমন কোন কারণ আছে যার ফলে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে মিল হবে না। তাদের পরস্পরের রুচী ও মেজাযের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। অথবা এমন কথা জানা গেল যা পূর্বে জানা ছিলো না। এসকল অবস্থায় অপর পক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা আপনাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছিলাম, এখন অমুক অসুবিধার কারণে তা রক্ষা করতে পারছি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উযর বা অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সে সময় পর্যন্ত, ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও যদি ওয়াদা পূরণ না করে, তাহলে এ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী সে মুনাফিকের দলভুক্ত হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ও আবু জাহ্‌লের ঘটনা

আল্লাহু আকবার! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এমন কঠিন ওয়াদা রক্ষা করেছেন, যার কল্পনাও আজ করা যায় না। বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজদার (গোপান কথা জানেন এমন) ছিলেন। তাঁর ঘটনা। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) এবং তাঁর পিতা

হযরত ইয়ামান (রাযিঃ) মুসলমান হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে মদীনা যাচ্ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের অন্যতম দুশমন আবু জাহ্ল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সসৈন্যে মদীনা অভিমুখে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে হযরত হুযায়ফার আবু জাহ্লের সাথে দেখা হয়ে গেল। আবু জাহ্ল তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলো ঃ কোথায় যাচ্ছো? তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পবিত্র মদীনায় যাচ্ছি। আবু জাহ্ল বললো ঃ তাহলেতো তোমাদেরকে ছাড়া যাবে না। কারণ তোমরা ছাড়া পেলে মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে শরীক হবে। তাঁরা বললেনঃ আমরা শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছি। আমরা যুদ্ধে শরীক হবো না। আবু জাহ্ল বললো ঃ তাহলে আমাদের সাথে এ ওয়াদা করো যে, সেখানে গিয়ে শুধু সাক্ষাৎ করবে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তাঁরা আবু জাহ্লের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। অতঃপর আবু জাহ্ল তাদেরকে ছেড়ে দিলো। তাঁরা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পৌছলেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-কে সাথে নিয়ে "বদর" যুদ্ধের জন্য মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন, রাস্তায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো।

হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই-বদর যুদ্ধ

চিন্তা করা দরকার যে হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই-ইসলামের প্রথম জিহাদ গায্ওয়ায়ে বদর প্রত্যাসন্ন। আর এ এমন লড়াই যাকে পবিত্র কুরআনে

অর্থাৎ হক ও বাতিলের পার্থক্যের দিন বলে আখ্যায়িত করেছে। সেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছে। আর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ পাকের নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন, তাদেরকে বদরী বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। সাহাবায়ে

কিরামের মাঝে বদরী সাহাবীদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। এ সকল সাহাবায়ে কিরামের নাম অজিফা রূপে পাঠ করা হয়। এদের নামের বরকতে আল্লাহ্ পাক দু'আ কবুল করেন। যাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকল সাহাবীকে আল্লাহ্ পাক মাফ করে দিয়েছেন। সে জিহাদ সংগঠিত হতে যাচ্ছে।

গর্দানের উপর তরবারী রেখে যে ওয়াদা নেয়া হয়েছে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎকালে হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর তাঁরা দরখাস্ত পেশ করলেন ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি বদর যুদ্ধের জন্য যাচ্ছেন, আমাদেরও ইচ্ছা এ যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক হওয়ার। আর আবু জাহ্লের সাথে আমরা যে ওয়াদা করেছি, তার অবস্থা হলো, সে আমাদের গর্দানের তরবারী চেঁপে ধরে কথা আদায় করেছে যে, আমরা এ জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না। তখন যদি আমরা তার কথায় সম্মত হয়ে ওয়াদা না করতাম, তাহলে সে আমাদেরকে আটকে রাখতো। এখন আপনি আমাদেরকে এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিন। যাতে আমরাও এর ফযিলত হাছিল করতে পারি। (আলইসাবাহ্ ১ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ) কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তোমরা তাদের সাথে ওয়াদা করে যবান দিয়ে এসেছো এবং তোমাদেরকে এ শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এখানে এসে শুধু সাক্ষাৎ করবে, তোমাদের নবীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। কাজেই তোমাদের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি নেই।

এটা মানব জীবনের কঠিন পরিক্ষার মুহুর্ত, সে তার যবান ও ওয়াদার প্রতি কতটুকু যত্নবান তার পরীক্ষা এ সময় হয়ে থাকে। আমাদের মত দুর্বল ঈমানের মানুষ হলে, হাজারো বাহানা বের করতো। হয়তো বলতো যে তাদের সাথে আমরা যে ওয়াদা করেছি, সেটা খাঁটি অন্তরে করিনি। তারাতো জোড়পূর্বক আমাদের নিকট হতে

ওয়াদা নিয়েছে। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন আমরা আরো কত কি বাহানা বের করতাম। অথবা এ বাহানা বের করতাম যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে শামিল হয়ে কুফরের মুকাবিলা করাই ছিলো সময়ের দাবী। কারণ মুসলমান মুজাহিদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন, যাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র প্রায় ছিলো। কাজেই সেখানে একটি মানুষেরও খুবই মূল্য ছিলো। তাদের নিকট মাত্র ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া, আর ৮ খানা তলোয়ার ছিলো। অবশিষ্টদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে পাথর ইত্যাদি ছিলো। মুজাহিদদের এ ক্ষুদ্র বাহিনী এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার মুকাবিলা করতে যাচ্ছিল। এজন্য লোকের খুবই প্রয়োজন ছিলো, তা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কথা দেওয়া হয়েছে এবং যে ওয়াদা করা হয়েছে সে ওয়াদা রক্ষা করতেই হবে, এর খিলাফ করা যাবে না।

জিহাদের উদ্দেশ্য

এ জিহাদ কোন রাজ্য বা ক্ষমতা দখলের জন্য করা হচ্ছিল না, বরং সত্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য করা হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি সত্যকে পদদলিত করে জিহাদ করা হয়, গোনাহে লিপ্ত হয়ে যদি দ্বীনের কাজ করা হয়, তাহলে তা কখনো দ্বীনের কাজ বলে গণ্য হবে না। আজ আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার আর সকল শ্রম বিফলে যাওয়ার পিছনে কারণ হলো, আমরা চাই ইসলামের প্রচার-প্রসার হোক, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, এর জন্য যতবড় মারাত্মক গোনাহ্ করারই প্রয়োজন হোক না কেন, যত মারাত্মক হারাম মাধ্যম অবলম্বন করার প্রয়োজনই হোক না কেন। সর্বদা আমাদের মস্তিস্কে হাজারো বাহানা ঘুরতে থাকে। যার দরুন অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, এখন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এ কাজ করা উচিত, কাজেই শরীয়তের এ আইনকে আপাতত ছেড়ে দাও। আগে সময়ের চাহিদা পূরণার্থে এ কাজ করো।

একেই বলে ওয়াদা পূরণ

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। গনিমত হাছিল করা, কিংবা বিজয়ী হয়ে বাহাদুর আখ্যা লাভ করা উদ্দেশ্য ছিলো না। শরীয়তের আইনের চাহিদা ছিলো যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পূর্ণ করা। সুতরাং হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) এবং তাঁর পিতা ইয়ামান (রাযিঃ) কে বদরের মত এক মহান ফযিলতপূর্ণ যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখা হলো। কারণ তারা শত্রু পক্ষের সাথে জিহাদে শরীক না হওয়ার ওয়াদা করে এসেছিলেন। একেই বলে যথার্থ ওয়াদা পূরণ করা।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর ঘটনা

বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুঁজে না পাওয়া গেলেও, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) এর ঘটনা। অবশ্য মানুষেরা অজ্ঞতা বশতঃ এই মহান সাহাবীর সমালোচনা ও তাঁর শানে বেআদবী করে নিজের পরকালকে বরবাদ করে থাকে। ওয়াদা পূরণ সম্পর্কে এ মহান সাহাবীর একটি বিস্ময়কর কাহিনী বলছি।

যুদ্ধের কৌশল

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) যেহেতু সিরিয়ায় বসবাস করতেন, তাই তৎকালিন পরাশক্তি ও বিশ্ব মোড়ল রোমানদের সাথে তাঁর প্রায় সর্বদাই যুদ্ধ লেগে থাকতো। একবার হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) রোমানদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করলেন। একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে এ ওয়াদা করলেন, যে তারিখ পর্যন্ত আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) মনে মনে ভাবলেন যে, মেয়াদ তো ঠিকই আছে, এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি আমি আমার সৈন্য

বাহিনী রোমান সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অকস্মাৎ আক্রমণ করে দিবো। কারণ এতে শত্রুপক্ষ প্রস্তুত হওয়ার সময় পাবে না। তারা মনে করবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই হয়তো শত্রু সৈন্য রওয়ানা হবে। এখানে আসতেও বেশ সময় লাগবে, এরপর হয়তো মুসলমানগণ আক্রমণ করবে। কাজেই আমি যদি মুজাহিদ বাহিনীকে পূর্বেই সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে সহজেই অল্প সময়ে বিজয় লাভ করতে পারবো।

এটা চুক্তির খিলাফ

উপরোক্ত চিন্তা ভাবনার পর হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় মুজাহিদ বাহিনীকে রোমান সীমান্ত বরাবর নিয়ে গেলেন, কিছু সংখ্যক মুজাহিদ সীমান্তের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত রাখলেন। আর যখনই যুদ্ধ বিরতি চুক্তির শেষ দিনের সূর্য অস্ত গেল, সাথে সাথে মুজাহিদ বাহিনীকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) এর এ কৌশল খুবই ফলপ্রসু প্রমাণিত হলো। কারণ রোমবাহিনী এ আকস্মিক আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) এর মুজাহিদ বাহিনী একের পর এক শহর, একের পর এক গ্রাম জয় করে বিজয়ের নেশায় এগিয়ে চললো, এ অবস্থায় হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) পিছন দিক থেকে এক ঘোড়সওয়ারকে দ্রুত সামনের দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। তিনি তার অপেক্ষায় দাড়িয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, এ ঘোড়সওয়ার হয়তো আমীরুল মুমিনিনের কোন নতুন পয়গাম নিয়ে আসছে। যখন ঘোড়সওয়ার হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছাকাছি পৌছে গেল, তখন সে আওয়াজ দিতে শুরু করলো

الله اكبر الله اكبر قفوا عباد الله قفوا عباد الله

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা সকল, দাড়াও। হে আল্লাহ্‌র বান্দা সকল, দাড়াও। সে যখন আরো নিকটবর্তী হলো, তখন মুয়াবিয়া

(রাযিঃ) তাকে চিনতে পারলেন। যে, ইনি হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রাযিঃ)। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ কি ব্যাপার? হযরত আমর ইবনে আবাছাহ উত্তর দিলেন ঃ

وفاء لاغدر وفاء لاغدر

অর্থাৎ ঃ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো ঃ ওয়াদা পূরণ করা, গাদ্দারী নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি তো কোন চুক্তি ভঙ্গ করিনি। আমি ঐ সময় আক্রমণ করেছি, যখন যুদ্ধ বিরতির সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে। আমর ইবনে আবাছাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ যদিও সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পর আক্রমণ করা হয়েছে, কিন্তু আপনি চুক্তির সময়ের ভেতরই মুজাহিদ বাহিনী রোম সীমান্তে নিয়ে এসেছেন এবং কিছু সংখ্যক মুজাহিদ সীমান্তের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। যা যুদ্ধ বিরতি চুক্তির লংঘন ছিলো। আমি আমার এ কান দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يخلفه ولا يشدنه الى
ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء

অর্থাৎ ঃ যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতির সাথে তোমাদের কোন চুক্তি হয়। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা প্রকাশ্যে এ ঘোষণার (যে আমরা চুক্তিকে খতম করে দিচ্ছি) পূর্বে চুক্তি লংঘন করতে পারবে না। সুতরাং মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কিংবা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি খতমের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে শত্রু সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বানীর আলোকে জায়িয হয়নি।

বিজিত এলাকা ফেরত দিলেন

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, একটি বিজয়ী বাহিনী, যারা একের পর এক শত্রুর এলাকা বিজয় করে চলছে। শত্রুপক্ষের বিরাট এলাকা

পদানত করেছে, বিজয়ের নেশায় যারা মত্ত। তাদেরকে পূর্ব অবস্থানে ফিরিয়ে আনা কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু রাসূলের গোলাম, খোদা প্রেমিক হযরত মুয়াবিয়ার (রাযিঃ) কানে যখন একথা পড়লো, যে নিজের ওয়াদা পূর্ণ করা মুসলমানের জন্য আবশ্যক। তখন সাথে সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় মুজাহিদ বাহিনীকে হুকুম করলেন, যতখানি এলাকা বিজিত হয়েছে, তার সবই ফেরত দিয়ে দাও। সুতরাং সাথে সাথে পূর্ণ এলাকা ফেরত দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে ফিরে আসলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে অন্য কোন জাতি এ দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না যে, কেবলমাত্র চুক্তি ভঙ্গের ভয়ে তারা নিজেদের বিজিত এলাকা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের যেহেতু কোন ভূ-খন্ড দখলের প্রতি দৃষ্টি ছিলো না। না কোন ক্ষমতা বা নেতৃত্ব উদ্দেশ্য ছিলো। তাদের উদ্দেশ্য একটিই ছিলো যে, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই যখন জানতে পারলো যে, ওয়াদা খিলাফ করা দুরস্ত নয়, আর এক্ষেত্রে ওয়াদা খিলাফের কিছুটা সন্দেহ হচ্ছে। কাজেই তারা বিজিত এলাকা ছেড়ে ফিরে আসলেন। একেই বলে ওয়াদা রক্ষা করা। যখন যবান থেকে কোন কথা বের হয়ে যায়। তখন তার খিলাফ হবে না।

হযরত ফারুকে আযমের (রাযিঃ) ঘটনা

হযরত ফারুকে আযম ওমর (রাযিঃ) যখন বায়তুল মোকাদ্দাছ বিজয় করলেন, তখন তিনি সেখানে অবস্থানরত খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের সাথে এ চুক্তি করলেন যে, আমরা তোমাদের জান ও মালের হিফাযত করবো, বিনিময়ে তোমরা আমাদিগকে জিযিয়া[১] প্রদান করবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বৎসর জিযিয়া আদায় করতে লাগলো। একবার মুসলমানদের অন্য শত্রুর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হলে, বায়তুল

১ জিযিয়া ঃ এক প্রকার ট্যাক্স যা অমুসলিমদের নিকট হ'তে তাদের জান ও মালের হিফাযতের গ্যারান্টির বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে উসুল করা হয়।

মোকাদ্দাছের হিফাযতে নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে উক্ত যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলো। মুসলমানদের মধ্য হতে একজন প্রস্তাব করলো, যেহেতু বায়তুল মোকাদ্দাছে অনেক মুজাহিদ আছে, এখান থেকে তাদেরকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) বললেন ঃ প্রস্তাবতো খুব সুন্দর কাজেই মুজাহিদদেরকে এখান থেকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তবে সাথে সাথে আরেকটি কাজও করতে হবে। আর তাহলো, এখানে যত খৃষ্টান ও ইয়াহুদী আছে, তাদেরকে একত্রিত করে একথা বলে দাও যে, আমরা তোমাদের জান মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলাম। আর এ কাজের জন্য এখানে মুজাহিদ বাহিনী নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু এখন এসকল মুজাহিদের অন্যত্র প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়, তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমরা তোমাদের জান মালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারছিনে। সুতরাং তোমরা জিযিয়া হিসেবে আমাদেরকে যে ট্যাক্স আদায় করেছো, আমরা তা ফেরত দিচ্ছি। তোমরা নিজেদের হিফাযতের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নাও। এ ছিলো মুসলমানদের ঐতিহ্য। দুনিয়ার অন্য কোন জাতি এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে না।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রচলিত রূপ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন। কাজেই এ থেকে সকল মুসলমানের বেঁচে থাকা উচিত। গত জুম্আয় যেমন আমি মিথ্যার অনেক প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যাকে আমরা মিথ্যার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছি এবং তাতে নির্দ্বিধায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। তদ্রুপ ওয়াদা ভঙ্গের অনেক প্রকার এমন আছে, যেগুলোকে আমরা ওয়াদা ভঙ্গই মনে করি না। সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় ওয়াদা খিলাফ করা কেমন? এর উত্তরে সকলে বলবেন খুবই খারাপ কাজ,

মারাত্মক গোনাহ্। কিন্তু বাস্তব জীবনে যখনই সময় আসে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করে থাকি। অথচ তাকে ওয়াদা ভঙ্গ মনেই করি না।

দেশের আইন মেনে চলা ওয়াজিব

আমি এখন একটি কথা বলছি, যার দিকে সাধারণত মানুষ মনোযোগই দেয় না। আর একে ধর্মীয় ব্যাপারও মনে করে না। এজন্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব (রহঃ) বলতেন ঃ ওয়াদা শুধুমাত্র যবান দ্বারা হয় না, আ'মল দ্বারাও ওয়াদা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করে, সে কার্যতঃ সে দেশের সরকারের সাথে ওয়াদা করে যে, আমি আপনার রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলবো। এক্ষেত্রে সে দেশের আইন মেনে চলা ঐ ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। অবশ্য যদি সে দেশের কোন আইন এমন হয় যে, সে আইনের প্রয়োগ তাকে গোনাহ্ করতে বাধ্য করে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ কানুন মেনে চলা জায়িয নয়। কারণ এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কাজে কোন মাখলুকের আনুগত্য জায়িয নয়।

কাজেই এ ধরনের আইনের পাবন্দি করা ওয়াজিব তো নয়ই জায়িযও নয়। আর যে সকল আইন এমন নয়, অর্থাৎ গোনাহের কাজ করতে বাধ্য করে না, এরূপ আইন মেনে চলা এজন্য ওয়াজিব যে, আপনি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার মাধ্যমে কার্যতঃ এ ওয়াদা করেছেন, যে আমি রাষ্ট্রের সকল আইন মেনে চলবো। সুতরাং এ ওয়াদা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় মুনাফিক হিসাবে গণ্য হতে হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও ফিরাআউনের আইন

এ প্রসঙ্গে আমার আব্বাজান (রহঃ) হযরত মূসা আলাহিস্ সালামের ঘটনা শোনাতেন, যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম

ফিরআউনের রাজ্যে বসবাস করতেন। তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বে কিবতী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে ঘুষি মেরে হত্যা করেছিলেন। এ বিখ্যাত ঘটনা পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এ ঘটনার জন্য ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন।

لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ

অর্থাৎ ঃ আমি তার সম্পর্কে একটি গোনাহ্ করে ফেলেছি, তার উপর আমি অন্যায় করেছি। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম একে অন্যায় ও গোনাহ্ মনে করে এ থেকে ইস্তিগফার করতেন। এখন প্রশ্ন হলো, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যাকে হত্যা করেছেন, সে তো কিবতী সম্প্রদায়ের হরবী[১] কাফির ছিলো। হরবী কাফিরকে হত্যা করায় আবার কিসের গোনাহ্। এর উত্তরে আমার আব্বাজান বলতেনঃ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাদের শহরে বসবাস করে কার্যতঃ এ ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি তোমাদের রাষ্ট্রের আইন মেনে চলবো। আর তাদের আইনে কাউকে হত্যা করা নিষেধ ছিলো। কাজেই কিবতীকে হত্যা করাটা আইন বিরোধী কাজ ছিলো।

মোটকথা রাষ্ট্রের সকল নাগরিক চাই, সে রাষ্ট্র মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম, প্রশাসনের সাথে কার্যতঃ এ ওয়াদা করে যে, সে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম মেনে চলবে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের আইন তাকে কোন গোনাহ্ করতে বাধ্য না করে সে সময় পর্যন্ত আইন মেনে চলা ওয়াজিব।

ভিসা একটি ওয়াদা

বিদেশ ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভিসা নেওয়াটাও কার্যতঃ সে রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদা করা। চাই সে রাষ্ট্র অমুসলিমই হোক না কেন।

---

১ হরবী ঃ যোদ্ধা, শরীয়তের পরিভাষায় এমন অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে বলা হয় যে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি।

যেমন ঃ কেউ ইন্ডিয়া, আমেরিকা বা ইউরোপের ভিসা নিয়ে চলে গেল। কোন রাষ্ট্রের ভিসা নেওয়ার অর্থ হলো সে রাষ্ট্রের সাথে কার্যতঃ এ ওয়াদা করা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের আইন কোন গোনাহের কাজ করতে বাধ্য না করে, সে সময় পর্যন্ত আইন মেনে চলা হবে। অবশ্য যে আইন কোন গোনাহের কাজে বাধ্য করে সে আইন মেনে নেওয়া জায়িয নয়। কাজেই যে সকল আইন মানুষকে গোনাহের কাজ করতে বাধ্য না করে, কিংবা অসহনীয় অত্যাচারের কারণ না হয়। সে সকল আইন মেনে চলাটাও প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা পালনের অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাফিক আইন অমান্য করা গোনাহ্

যেমন দেশের ট্রাফিক আইন আছে যে, গাড়ী কখনো ডানে মোড় নিতে হয়, কখনো বামে। আবার লালবাতি জ্বললে থেমে যেতে হয়, সবুজ বাতি জ্বললে চলতে হয়। দেশের নাগরিক হিসেবে আপনি রাষ্ট্রের সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, আমি দেশের ট্রাফিক আইন মেনে চলবো। কাজেই যদি কেউ এ সকল ট্রাফিক আইন মেনে না চলে, তাহলে তা ওয়াদা ভঙ্গ করা হবে এবং গোনাহ হবে। অথচ মানুষ ট্রাফিক আইন অমান্য করাকে কোন গোনাহ্ই মনে করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে যখন কেউ ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ধরা না পড়ে, পার পেয়ে যায়। তখন নিজকে খুব সেয়ানা ও চালাক মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

দুনিয়া ও আখিরাতে দায়ী হতে হবে

মনে রাখা দরকার যে ট্রাফিক আইন অমান্য করা কয়েক দিক দিয়ে গোনাহ্। প্রথমতঃ এতে ওয়াদা ভঙ্গের গোনাহ্। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে এজন্য গোনাহ্ হবে, যে এ সকল ট্রাফিক আইন, নিয়ম-

শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং নাগরিক জীবনে একে অপর থেকে কোন প্রকার কষ্ট পাওয়া হতে বেঁচে থাকার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব যদি ট্রাফিক আইন ভঙ্গের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় বা কারো কোন ক্ষতি করা হয়, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য দায়ী হতে হবে।

এটাও ধর্মের বিধান

এ সকল কথা এজন্য বলা হচ্ছে, যে সাধারণতঃ মানুষেরা এগুলোকে নিছক দুনিয়াদারীর কথাবার্তা মনে করে থাকে। আর এ সকল কথা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ভাল মতো মনে রাখা দরকার যে, এটাও আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের অংশ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বীনদারী কেবলমাত্র সীমিত কিছু জিনিষের নাম নয়।

মোটকথা যে সকল আইন কোন গোনাহের কাজে বাধ্য করে, তা মেনে চলা জায়িয নয়। আর যে সকল আইন অসহনীয় দুঃখ কষ্টের কারণ হয়, তাও মানার প্রয়োজন নেই। তবে যে সকল আইন এরূপ নয়, সে সকল আইন মেনে চলা শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের উপর ওয়াজিব। অনেক কাজ এমন আছে যেগুলোর মধ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও আমরা তাকে অন্যায় বা গোনাহ্ই মনে করি না। অথচ সে সকল কাজের মধ্যে সর্বদাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মাধ্যমে গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এ সকল বিষয় থেকে সযত্নে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ও ক্ষেত্রের জন্যই শরীয়তের বিধান আছে। সকল ক্ষেত্রে তার প্রতি লক্ষ্য না রাখা দ্বীনদারী ও ধর্মের পরিপন্থি।

মুনাফিকের দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, তৃতীয় নিদর্শন হলো "আমানতে খিয়ানত করা" এর গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। আমরা খিয়ানতের ব্যাপারেও গাফলতি ও ভ্রান্তির শিকার। কারণ অসংখ্য কাজ এমন আছে যা খিয়ানতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাকে খিয়ানতই মনে করিনা। এখন যেহেতু সময় কম এজন্য আগামী জুম্‌আয় আল্লাহ্‌পাক যদি হায়াত রাখেন, তাহলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমরা যে সকল কথা আলোচনা করলাম, আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে এর উপর আ'মল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

খিয়ানত ও তার প্রচলিত রূপ

তারিখ ও তারিখ ঃ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯১ শুক্রবার বাদ আসর
স্থান ঃ বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ
গুলশান ইকবাল, করাচী, পাকিস্তান

বয়ানের সার-সংক্ষেপ

সকল মানুষের নিকট সবচেয়ে বড় আমানত, যা থেকে কেউই বাদ পড়েনি, তাহলো তার জীবন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তার সময়। কোন ব্যক্তি যদি একথা মনে করে যে, সে তার চোখ, কান, নাক, যবান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গের মালিক। কাজেই যেভাবে মনে চায় এগুলো ব্যবহার করবে। তাহলে এটা তার মারাত্মক ভুল হবে। বরং একথা মনে করতে হবে যে, এ সকল অঙ্গ আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দান করেছেন এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্রও বলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত এ আমানতের চাহিদা হলো, আমরা আমাদের এ জীবনকে আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, আমাদের যোগ্যতা ও আমাদের শক্তিকে কেবলমাত্র ঐ সকল কাজেই ব্যবহার করবো, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ পাক এগুলো দিয়েছেন। এছাড়া অন্য কাজে এগুলো ব্যবহার করলে আল্লাহ্‌তা'আলা প্রদত্ত আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে।

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

عن ابي هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف

واذا اوتمن خان وفي رواية وان صام وصلى وزعم

انه مسلم

খিয়ানত ও তার প্রচলিত রূপ

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করে, একথার দিকে ইশারা করেছেন যে, এ তিনটি কোন ঈমানদারের কাজ নয়। কাজেই এ তিন অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে সত্যিকার অর্থে মুমিন এবং মুসলমান বলার উপযুক্ত নয়। এর দু'টির আলোচনা বিগত দু'জুম্‌আ'য় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আমানতের গুরুত্ব

মুনাফিকের তৃতীয় নিদর্শন হলো, আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা। অর্থাৎ কারো আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা কোন মুসলমানের কাজ নয়। বরং মুনাফিকের কাজ। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীস শরীফে আমানত রক্ষা করার এবং তার চাহিদা পূর্ণ করার তাকিদ করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানতসমূহ তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার। আমানতের এত বেশি

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

অর্থাৎ ঃ যার মধ্যে আমানত নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই। ঈমানের আবশ্যম্ভাবী চাহিদা হলো, ঈমানদার ব্যক্তি আমীন তথা বিশ্বস্তও হবেন। তিনি কারো আমানতের মধ্যে কোনরূপ খিয়ানত করবেন না।

আমানত সম্পর্কে ভুল ধারণা

আজকের মজলিসে যে কথার দিকে মনযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য তাহলো, আমরা আমানতের সীমা রেখাকে খুবই সংকীর্ণ করে ফেলেছি। আমাদের মস্তিস্কে আমানত সম্পর্কে এতটুকু ধারণা আছে যে, কেউ আমার নিকট এক থলি টাকা নিয়ে এসে বললোঃ এ টাকার থলিটি আপনি আমানত স্বরূপ আপনার কাছে রাখুন। যখন আমার প্রয়োজন হবে, তখন নিয়ে নিবো। এটাকেই আমরা আমানত মনে করে থাকি। এখন যদি কেউ এ আমানতের মধ্যে খিয়ানত করে, এ সকল টাকা খেয়ে শেষ করে দেয়, অথবা যখন ঐ ব্যক্তি টাকা ফেরত চাওয়ার পর সে তা অস্বীকার করে, তাহলে একেই আমরা খিয়ানত মনে করি। আমাদের মস্তিস্কে আমানত এবং খিয়ানত সম্পর্কে এতটুকুই ধারণা, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। অবশ্য এটাও আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় আমানত এতটুকুতেই সীমিত নয়, বরং আমানতের অর্থ আরো অনেক বিস্তৃত অনেক ব্যাপক। এমন অনেক জিনিষই আমানতের মধ্যে শামিল যেগুলো সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই যে, এও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে আমানত স্বরূপ আচরণ করতে হবে।

আমানতের অর্থ

আরবী ভাষায় "আমানত" এর অর্থ হলো কোন ব্যাপারে কারো উপর ভরসা করা। কাজেই প্রত্যেক ঐ জিনিষ যা অন্যের নিকট এভাবে সোপর্দ করা হয় যে, সোপর্দকারী তার উপর এ ভরসা করে যে, সে এর হক্ব পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে। একেই শরীয়তে আমানত বলা হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো দায়িত্বে কোন কাজ, কোন মাল অথবা কোন জিনিষ এই ভরসা ও আস্থা নিয়ে সোপর্দ করে যে, সে এ ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পরিপুর্ণরূপে পালন করবে, এতে কোন প্রকার অলসতা করবে না, তাহলে একে আমানত বলা হবে। এখন আমরা যদি আমানতের এ ব্যাপক অর্থকে সামনে রাখি, তাহলে অসংখ্য জিনিষ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আলাছ্তু[১] দিবসের স্বীকারোক্তি

আল্লাহ্ পাক আলাছ্তু দিবসে মানব সম্প্রদায় থেকে স্বীকারোক্তি বা অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তোমরা কি আমার আনুগত্য করবে না? সকল মানুষই সে দিন স্বীকার করেছিলো। অবশ্যই আপনি আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার আনুগত্য করবো। এ অঙ্গিকারকে পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আহ্যাবের শেষ রুকুতে আমানত বলে আখায়িত করা হয়েছে।

যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

অর্থাৎ ঃ আমি জমীনের (পৃথিবীর) নিকট আমানত পেশ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি কি এ আমানতের বোঝা বহন করতে

১ ঃ আল্লাহ পাক মানুষের নিকট হতে উর্ধ্বজগতে একটি স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। যেদিন সেই স্বীকারোক্তি নিয়েছেন, সে দিনকেই ইয়াওমে আলাছ্তু বলা হয়।

পারবে? তখন সে এ আমানত বহন করতে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আসমানের নিকট পেশ করে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি কি এ আমানতের বোঝা বহন করবে? সেও অস্বীকার করেছে। অতঃপর পর্বতশ্রেণীর উপর পেশ করেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি তোমরা কি বহন করবে? তারাও এ বোঝা বহন করতে অস্বীকার করেছে। সকলেই এ আমানতের বোঝা বহন করতে ভয় পেয়েছে। কিন্তু যখন এ আমানত মানব সম্প্রদায়ের নিকট পেশ করা হলো, তখন তারা বড় বাহাদুরের মত অগ্রসর হয়ে এ আমানতের বোঝা বহন করার স্বীকৃতি জানালো যে, আমরা এ বোঝা বহন করবো। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ মানুষ অত্যন্ত জালিম ও মুর্খ যে, এত বড় (কঠিন) বোঝা বহন করার জন্য অগ্রসর হলো। অথচ এ চিন্তা করলো না যে, এ কঠিন বোঝা বহনে ব্যর্থতার পরিচয় না দেই, যার ফলশ্রুতিতে আমার শেষ পরিণতি ভয়াবহ এবং খারাপ না হয়ে যায়। মোটকথা এ (দায়িত্বের) বোঝাকে আল্লাহ্ পাক আমানত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমাদের এ জীবন আমানত

এ আমানত কি জিনিষ ছিলো যা ইনসানের নিকট পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাছ্ছিরিনে কিরাম লিখেছেন ঃ মানব সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছিলো, তোমাদেরকে এমন এক জীবন দান করা হবে। যে জীবনে তোমাদের সৎ কাজ করার স্বাধীনতাও থাকবে আর খারাপ কাজ করার স্বাধীনতাও থাকবে। যখন তোমরা সৎ কাজ করবে, তখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতের চীরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ অর্জন করবে। আর যদি অসৎ কাজ করো, তাহলে তোমরা আমার গজবের শিকার হবে। আর দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি তোমাদের ভোগ করতে হবে। এখন বলো ঃ তোমাদের আমার এ প্রস্তাব মঞ্জুর কিনা? সুতরাং দেখা গেল অন্যান্য সব কিছুতো এ বোঝা বহন করতে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু মানব সম্প্রদায় এ বোঝা বহন

করতে তৈরি হয়ে গেল। হাফিজ সিরাজী (রহঃ) নিম্নোক্ত কবিতায় একথাই বর্ণনা করেছেন ঃ

ہ آسمان بار امانت نتوانکشید ؛ قرعہ فال بنام من دیوانہ زد

আসমানতো এ বোঝা বহন করতে পারলোনা সে অস্বীকার করলো, যে এ আমার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু মাটির মানুষ এ বোঝা বহন করায় আমার নামে তা এসে গেল। মোটকথা পবিত্র কুরআনে একে আমানত বলা হয়েছে।

মানব দেহ একটি আমানত

আমাদের পূর্ণ জীবনটাই আমাদের নিকট আমানত। এ আমানতের চাহিদা হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করা। মানুষের নিকট সবচেয়ে বড় আমানত (যা থেকে কেউই বাদ নয়) তার অস্তিত্ব, তার জীবন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার সময় ও তার শক্তি-সামর্থ। মানুষ মনে করে আমি আমার হাত, পা, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির মালিক। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমাদের নিকট আমানত। আমরা এগুলোর মালিক নই যে, যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবো। এ সকল নিয়ামত আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দান করেছেন। সুতরাং এ সকল নিয়ামতের চাহিদা হলো, নিজ জীবন, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ, নিজের যোগ্যতা ও নিজের শক্তি সামর্থকে ঐ কাজেই ব্যয় করতে হবে, যে কাজের জন্য এগুলো দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করলে আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। যা একান্তই হারাম।

চক্ষু একটি নিয়ামত

যেমন চক্ষু আল্লাহ্ পাকের একটি নিয়ামত, যা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন। এ চক্ষু আল্লাহ্ পাকের এমন এক অপূর্ব নিয়ামত যা দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করে হাসিল করা সম্ভব নয়। এ নিয়ামতের মূল্যায়ন (কদর) আমরা এজন্য করি না যে, জন্মের সময় হতেই এ সরকারী মেশিন আমাদের দেহে লেগে আছে, অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ চক্ষু পাওয়ার জন্য কোন শ্রম বা অর্থ খরচ করতে হয়নি। কিন্তু যখন এ দৃষ্টি শক্তিতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিবে এবং বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিবে তখন বুঝে আসবে এর কি মূল্য। আর এ সময় মানুষ একটি চোখের দৃষ্টি শক্তি ঠিক রাখার জন্য তার সকল পুঁজি ব্যয় করতেও তৈরি হয়ে যায়। চক্ষু আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন মেশিন যা কোন সময় সার্ভিস কিংবা মেরামত করারও প্রয়োজন হয় না। তার কোন মাসিক খরচও নেই, ট্যাক্সও নেই, ভাড়াও নেই। একান্তই বিনা পয়সায় পাওয়া গেছে।

চক্ষু একটি আমানত

কিন্তু এ মেশিন আমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের আমানত। তিনি বলে দিয়েছেন, এ মেশিন কিভাবে ব্যবহার করবো। এ চক্ষু দিয়ে দুনিয়াকে দেখো, দুনিয়া অবলোকন করো, পৃথিবীর সৌন্দর্য অবলোকন করে তৃপ্তি লাভ করো। সব কিছু করো। কিন্তু কয়েকটি জিনিষ এ চোখ দিয়ে দেখতে নিষেধ করেছেন। কাজেই এ সরকারী মেশিনকে সকল কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক এ চক্ষু দিয়ে যারা মাহরাম নন এমন মহিলার দিকে দেখতে নিষেধ করেছেন। কাজেই আমরা যদি এ চক্ষু দিয়ে গায়র মাহরাম মহিলার দিকে তাকাই তাহলে তা আল্লাহ্ পাকের আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে গায়র মাহরামদের দিকে তাকানোকে খিয়ানত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ

অর্থাৎ ঃ চোখের খিয়ানতকে আল্লাহ্ পাক জানেন, যে তুমি এ চক্ষুকে এমন জায়গায় ব্যবহার করেছো, যেখানে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যে কেউ কারো নিকট নিজের মাল আমানত রাখলো, এখন এ ব্যক্তি মালিকের অসম্মতি ও অনুপস্থিতিতে আড়ালে-আবডালে চোরাপানি করে এ মাল ব্যবহার করে থাকে। এরূপ আচরণই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের সাথেও করে থাকে। অথচ ঐ নির্বোধের খবরও নেই, যে আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন আ'মলই লুকায়িত থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক চোখের খিয়ানতকে মারাত্মক গোনাহ্ ও অন্যায় বলেছেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

যদি দৃষ্টি শক্তি তথা চোখ রূপে প্রদত্ত আল্লাহ্ পাকের এ নিয়ামত ও আমানতের যথাযথ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ পাকের রহমত নাজিল হয়। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বাহির থেকে ঘরে এসে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং স্ত্রীও স্বামীর দিকে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে আল্লাহ্ পাক তাদের উভয়ের প্রতি স্বীয় রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। কারণ এ ব্যক্তি আমানতকে যথাযথ স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে। যদিও সে ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও ব্যক্তিগত ফায়দার জন্য এ কাজ করে থাকে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাকের হুকুম অনুযায়ী এ কাজ করেছে, কাজেই আল্লাহ্ পাকের রহমত নাযিল হয়।

কান একটি আমানত

শ্রবণ করার জন্য আল্লাহ্ কান দিয়েছেন। কিছু কিছু জিনিষ বাদে সকল জিনিষই এ কান দিয়ে শোনার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক এ কান দিয়ে গান, বাদ্য, পরনিন্দা, মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা শুনতে নিষেধ

করেছেন। কাজেই যদি কান দিয়ে এ সকল নিষিদ্ধ জিনিষ শোনা হয়, তাহলে এটা আমনতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। যা মারাত্মক গোনাহ্।

যবান একটি আমানত

যবান আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি অপূর্ব নিয়ামত যা জন্ম থেকে নিয়ে চলছে, মৃত্যু পর্যন্ত চলবে। মানুষ যবানকে সামান্য হেলিয়ে অসংখ্য কাজ নিচ্ছে। যবান আল্লাহ্ পাকের এত বড় নিয়ামত যে যবানকে সামান্য হেলিয়ে সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলে দাও। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে এর দ্বারা আমলের পাল্লার অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যাবে। কাজেই এ যবানকে ব্যবহার করে আখিরাতের সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু যদি এ যবানকেই গীবতের মধ্যে, মিথ্যা বলার মধ্যে, কিংবা কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ পাকের আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে।

আত্মহত্যা হারাম কেন?

আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু নয়, বরং আমাদের পূর্ণ শরীর, আমাদের জীবন সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট আমানত। অনেকে মনে করে আমাদের শরীর আমাদের নিজস্ব। কাজেই এ শরীরের সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করা যাবে। এ ধারণা ঠিক নয়, একান্তই ভুল। বরং এ শরীর আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট আমানত। আর এ কারণে ইসলামী শরীয়তে আত্মহত্যাকে মারাত্মক হারাম বলা হয়েছে। যদি এ শরীর আমাদের নিজস্ব হতো, তাহলে আত্মহত্যা কেন হারাম হতো। একে এজন্যই হারাম করা হয়েছে, যে আমাদের প্রাণ, আমাদের শরীর, আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন কিছুই আমাদের মালিকানায় নয়। বরং আল্লাহ্ পাকের মালিকানায়। যেমন এ পুস্তকটি আমার মালিকানায় আছে, এখন যদি আমি কাউকে এ পুস্তক দিয়ে বলি তুমি

ইহা নিয়ে যাও, তাহলে এটা আমার জন্য জায়িয হবে। কিন্তু কেউ যদি কাউকে বলে যে তুমি আমাকে হত্যা করো। আমার জীবন শেষ করে দাও। সে ষ্ট্যাম্প পেপারে লিখে দস্তখত করে, সীল মেরে দিয়ে দিলো যে, তুমি আমাকে হত্যা করো। সবকিছু করা সত্ত্বেও তার জন্য ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়িয হবে না। কারণ হলো, এ জীবন তার মালিকানাধীন নয়। যদি তার মালিকানায় হতো, তাহলে সে অন্যকে শেষ করার অনুমতি দিতে পারতো। যেহেতু এ জীবন ও প্রাণ তার মালিকানায় নয়। কাজেই সে অন্যকে এ জীবন, এ প্রাণ শেষ করার অনুমতি দেওয়ারও কোন হক (অধিকার) রাখে না।

গোনাহের কাজ করা খিয়ানত

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আমাদের জীবন, আমাদের শক্তি ও সামর্থকে আমানত স্বরূপ দান করেছেন। কাজেই গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের পূর্ণ জীবনটাই আমাদের নিকট আমানত। এজন্য আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ, কোন কথা, কোন কর্মই যেন এমন না হয়, যা খিয়ানতরূপে গণ্য হতে পারে। সুতরাং আমানতের যে সংক্ষিপ্ত ধারণা আমাদের চিন্তায় আছে যে, কেউ টাকার থলি নিয়ে এসে বলবে ভাই এটা আমানত রাখুন, আমরা সেটা সিন্দুকে ভরে তালা লাগিয়ে দিবো। তারপর যদি ঐ টাকা বের করে খরচ করে ফেলি, কিংবা সে চাইলে তা দিতে অস্বীকার করি, তাহলেই আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে, অন্যথায় নয়। এ সংক্ষিপ্ত ধারণা একান্তই ভুল। আসল কথা হলো, আমাদের পূর্ণ জীবনটাই একটি আমানত এবং প্রতিটি কাজ ও কথা একটি আমানত।

কাজেই হাদীস শরীফে যে বর্ণিত হয়েছে, আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা মুনাফিকের নিদর্শন। এর অর্থ হলো, যত প্রকারের গোনাহ্ আছে, চাই তা চোখের গোনাহ্ হোক, অথবা কানের গোনাহ হোক বা যবানের গোনাহ হোক, কিংবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ্ হোক, এসবই আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এটা কোন মুমিনের কাজ নয়, বরং মুনাফিকের কাজ।

আ'রিয়াতের জিনিষ আমানত

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো আমানত সম্পর্কিত সাধারণ কথা ছিলো। কিন্তু আমানত সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথাও আছে। যেগুলোকে আমরা আমানত মনে করি না, বিধায় তার সাথে আমানতের মত আচরণও করা হয় না। যেমন আরিয়াতে আনিত জিনিষ। আ'রিয়াত বলা হয়, যেমন একজন লোকের একটি জিনিষের প্রয়োজন, যা তার কাছে না থাকার দরুন সে ঐ জিনিষ অন্য আরেকজনের নিকট হ'তে ব্যবহার করার জন্য চেয়ে আনলো যে, আমার অমুক জিনিষটির প্রয়োজন, কিছু সময়ের জন্য এ জিনিষ আমাকে দিন। একেই আ'রিয়াত বলে। আ'রিয়াত স্বরূপ আনা জিনিষ-পত্র আমানতের হুকুমে। অথবা মনে করুন, আমার এমন একটি বই পড়তে মনে চাচ্ছে, যা আমার নিকট নেই। কাজেই আমি অন্য একজনের নিকট হতে উহা চেয়ে আনলাম, যে আমি বইটি পড়েই ফিরিয়ে দিবো। এখন এ কিতাবটি শরীয়তের পরিভাষায় আমার নিকট আ'রিয়াত। আর আ'রিয়াতের জিনিষ আমানত স্বরূপ হয়ে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি কারো নিকট হতে কোন জিনিষ আ'রিয়াত হিসেবে আনবে তার জন্য ঐ জিনিষ মালিকের ইচ্ছের বিপরীত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়িয নেই। যেভাবে ঐ জিনিষ ব্যবহার করলে মালিকের কষ্ট হয়, সেভাবে তা ব্যবহার করা ঠিক নয়। আ'রিয়াত হিসেবে আনা জিনিষ যথা সময়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার অসংখ্য ওয়াজের মধ্যে বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, যখন কারো বাড়িতে কেউ খানা পাঠায়। তখন ঐ ব্যক্তিরতো অন্যায়-এটা হয়েছে যে, সে আপনার বাড়িতে খানা পাঠিয়েছে। এখন ছহীহ তরীকাতো

এটাই ছিলো যে, ঐ খানা সাথে সাথে অন্য প্লেটে রেখে তার প্লেট ফেরত দিয়ে দেওয়া। কিন্তু আজ কাল যা হয়, তাহলো যে ব্যক্তি খানা পাঠায় সে প্লেট থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। যার বাড়িতে খানা পাঠানো হয়েছে, তার বাড়িতে এ এতীম প্লেটগুলো গড়াগড়ি খেতে থাকে। ফেরত দেওয়ার আর চিন্তা করা হয় না। কোন কোন সময় তো এ সকল প্লেট এ ব্যক্তি নিজেই ব্যবহার শুরু করে দেয়। এরূপ করাটা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা। কারণ হলো এ সকল প্লেট আপনার নিকট আ'রিয়াত দেয়া হয়েছিলো। আপনাকে এগুলোর মালিক বানানো হয় নাই। কাজেই এ প্লেট ব্যবহার করা কিংবা এগুলো ফেরত দেওয়ার চিন্তা না করা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার শামিল।

বইটি আপনার নিকট আমানত

আপনি কোন ব্যক্তির নিকট হতে পড়ার জন্য একটি বই নিলেন, পড়া শেষ করে এ বই ফেরত দেননি, তাহলে এটা আমানতের মধ্যে খিয়ানত হয়ে যাবে। অথচ আজকাল কোন কোন অপরিনামদর্শী লোকদের মুখে এমন কথাও শোনা যায় যে, বই চুরি করা জায়িয। কাজেই এদের নিকট বই চুরি করা যখন জায়িয, তখন বই সংক্রান্ত আমানতের মধ্যে খিয়ানত করাটাও জায়িয হবে। অতএব দেখা যায় অনেকে পড়ার জন্য বই নিয়ে আর ফেরত দেয়ার নাম নেয় না। অথচ এ সবই আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। আরিয়াতের সকল জিনিষ (চাই যেটা যেভাবেই আপনার নিকট আসুক না কেন) খুব হিফাযত করে রাখা এবং মালিকের মর্জির খিলাফ ব্যবহার না করা উচিত। আর এর বিপরিত করা জায়িয নয়।

চাকুরীর নির্দ্ধারিত সময় আমানত

কেউ যদি কোথাও চাকুরী নেয় এবং এ সময় আট ঘন্টা ডিউটি করার চুক্তি করে, তাহলে এ আট ঘন্টা সে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করলো। কাজেই এ আট ঘন্টা সময় আপনার নিকট ঐ

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আমানত। সুতরাং ঐ আট ঘন্টা হতে ১ মিনিট সময়ও যদি আপনি এমন কোন কাজে ব্যয় করেন, যে কাজে ব্যয় করার অনুমতি ঐ মালিক বা প্রতিষ্ঠান দেয়নি, তাহলে এটা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। যেমন ডিউটির সময় কোন বন্ধু বা আত্মীয় সাক্ষাৎ করতে আসলো, এখন ছুটি না নিয়ে তাকে সঙ্গে করে হোটেলে গিয়ে খেয়ে দেয়ে আড্ডা মারতে শুরু করে দিলেন। অথচ এ সময়টা ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা হয়েছে, যা আপনার নিকট আমানত স্বরূপ ছিলো। কাজেই যখন ঐ সময়কে মালিকের অনুমতি ব্যতিত হাসি-ঠাট্টা ও আড্ডায় অতিবাহিত করা হলো, এটা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হলো।

এখন চিন্তা করা দরকার, যে আমরা কিরূপ গাফলতির মধ্যে আছি, যে আমাদের বিক্রিত সময়কে আমরা অন্য কাজে ব্যয় করছি। যার দরুন মাসের শেষে আমরা যে বেতন নিচ্ছি সেটা আমাদের জন্য পরিপূর্ণরূপে হালাল হচ্ছে না। কারণ আমরা সময় পুরো দেয়নি।

দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাযদের নিয়ম

দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাযদের জীবনাচরণের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যে আসলে আল্লাহ্ পাক তাদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের যুগের স্মৃতিকে পুনর্জীবিত করেছেন। সে সকল আসাতিয়াযে কিরামের মাসিক বেতন দশ থেকে পনের টাকার ঊর্দ্ধে ছিলো না। তা সত্ত্বেও বেতন নির্ধারণের মাধ্যমে যেহেতু তাঁরা নিজেদের সময়কে মাদ্রাসার নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, যদি মাদ্রাসার নির্দ্ধারিত সময়ে কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সাক্ষাৎ করতে আসতো, তাহলে তাদের আসার সাথে সাথে ঘড়ি দেখে সময় লিখে নিতেন এবং তাড়াতাড়ি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে যে সময় তারা চলে যেতো সে সময় পুনরায় ঘড়ি দেখে সময় লিখে নিতেন। পুরো মাস এভাবে সময় নোট করে, মাসের শেষে তাঁরা নিজেরাই এ দরখাস্ত পেশ করতো যে, এ মাসে আমি মাদ্রাসার

নির্ধারিত সময় হতে এত ঘন্টা সময়, মাদ্রাসার কাজে লাগাতে পারিনি, নিজের কাজে লাগিয়েছি। কাজেই আমার বেতন হতে উক্ত সময়ের টাকা কেটে নেওয়া হোক, কারণ পূর্ণ বেতন আমার জন্য হালাল নয়। আমাদের অবস্থা হলো আমরা পাওয়ার জন্য তো দরখাস্ত পেশ করে থাকি, কিন্তু বেতন কেটে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত দেওয়ার কল্পনাও আমাদের মাথায় আসে না।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর বেতন

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাছান (রহঃ) যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ছিলেন। যার মাধ্যমে দারুল উলুম তার যাত্রা শুরু করেছে। আল্লাহ্ পাক শাইখুল হিন্দু (রহঃ) কে ইলম, মা'রিফাত ও তাকওয়ার খুব উঁচু মাকাম দান করেছিলেন। যে-সময় তিনি দারুল উলুমের শাইখুল হাদীস ছিলেন, সে সময় তাঁর বেতন ছিলো দশ টাকা। পরবর্তীতে যখন তাঁর অভিজ্ঞতা ও বয়স বেড়ে গেল, তখন দারুল উলুমের মজলিসে শূরার সদস্যগণ ফায়সালা করলেন, যেহেতু হযরতের বেতন একেবারেই কম, সে তুলনায় ব্যস্ততা ও খরচ অনেক বেশি কাজেই বেতন বাড়ানো হোক। কাজেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন হযরতের বেতন দশ টাকার স্থলে পনের টাকা দেওয়া হবে। যখন হযরত জানতে পারলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ পনের টাকা কেন দেওয়া হবে? লোকেরা বললো ঃ দারুল উলুমের মজলিসে শূরা আপনাকে পনেরো টাকা বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। তখন তিনি এ বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে, মুহ্তামিমে দারুল উলুমের নামে এই মর্মে দরখাস্ত লিখলেন যে, হযরত আপনি আমার বেতন বাড়িয়ে দশ টাকার স্থলে পনেরো টাকা করেছেন। অথচ এখন আমার বয়স বেড়ে গেছে। আগে খুব উৎসাহের সাথে দুই-তিন ঘন্টা সবক পড়াতাম। কিন্তু এখনতো আগের মত পড়াতে পারি না, কম পড়াই। মাদ্রাসায় সময় কম দেই। কাজেই

আমার বেতন বৃদ্ধির কোন বৈধতা নেই। সুতরাং আমার বেতন যা বাড়ানো হয়েছে তা ফেরত নেওয়া হোক। আর আমাকে পূর্বের ন্যায় দশ টাকাই দেওয়া হোক।

লোকেরা হযরতের নিকট এসে তোষামোদ করতে লাগলো যে, হযরত আপনি তো স্বীয় তাকওয়া এবং পরহেযগারীর কারণে বর্ধিত বেতন ফেরত দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য উস্তাযদের জন্য এতে অসুবিধার সৃষ্টি হবে যে, তাদের বেতন আপনার কারণে বাড়বে না। কাজেই আপনি এটা কবুল করুন। তা সত্ত্বেও হযরত এটা কবুল করেননি। কারণ হলো সর্বদা তার অন্তরে এ চিন্তা জাগ্রত থাকতো যে এ দুনিয়া সামান্য কয়েক দিনের জন্য, হতে পারে আজই শেষ হয়ে যাবে অথবা কালই শেষ হয়ে যাবে। যে বেতন আমি পাচ্ছি, তা পরিপূর্ণ হালাল না হলে আল্লাহ্ পাকের নিকট আমাকে লজ্জিত হতে হবে।

দারুল উলুম দেওবন্দ অন্যান্য ইউনিভার্সিটির মত নয় যে, উস্তায ক্লাশে সবক পড়ালেন, ছাত্রবৃন্দ পড়ে নিলো, ব্যস। বরং এটা এ সকল বুযুর্গের তাকওয়াও পরহেজগারীর নির্জাস। আল্লাহ্ পাকের নিকট জওয়াবদিহিতার ভয় ও খেদমতের মানসিকতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

মোটকথা চাকুরির চুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের সময়কে বিক্রি করে দিয়েছি। এ সময় আমাদের নিকট আমানত । এতে কোন প্রকার খিয়ানত না হয়।

আজ অধিকার আদায়ের যুগ

আজকাল মানুষেরা তাদের সকল শক্তি অধিকার আদায়ের জন্য ব্যয় করে থাকে। অধিকার আদায়ের জন্য মিটিং মিছিল করা হচ্ছে, শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে এবং একথা খুব জোড়ে-সোড়ে বলা হচ্ছে যে, আমাদেরকে আমাদের অধিকার পূর্ণরূপে দেওয়া হোক। প্রতিটি মানুষই এ দাবী করছে, যে আমাকে আমার অধিকার আমার হক্ব দেওয়া হোক। কিন্তু কেউ এ কথা চিন্তা করছে না, যে অন্যের যে অধিকার আমার উপর আছে, সেটা আমি যথাযথভাবে আদায় করছি

কিনা? আজ এ দাবীতো সবাই করে আমার বেতন বাড়ানো হোক। আমাকে পদোন্নতি দেওয়া হোক। আমার ছুটির এ ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমার জন্য এত এলাউন্স হওয়া চাই। কিন্তু যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা কতটুকু আদায় করছি সে চিন্তা, সে ফিকির আমার নেই।

নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন

অথচ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন-মানসিকতা এরূপ থাকবে যে, আমি অন্যের নিকট হতে নিজ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার হবো। আর অন্য কেউ যেন আমার নিকট কোন হক্বের দাবী না করে। আমি নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে অন্যের নিকট হতে অধিকার আদায়ের চেষ্টা চালাবো। মনে রাখা দরকার যে এরূপভাবে দুনিয়াতে কারো অধিকার (হক) আদায় হবে না। অধিকার আদায়ের একটিই মাত্র রাস্তা যা আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং এবং তাঁর রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাহলো, প্রত্যেকেই নিজ জিম্মাদারীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে তা আমি যথাযথভাবে আদায় করছি কিনা? যখন আমাদের সবার মাঝে দায়িত্ব সচেতনতা আসবে, তখন সকলের অধিকারই আদায় হয়ে যাবে। যদি স্বামী এ কথা অনুভব করে, যে স্ত্রীর প্রতি আমার যে দায়িত্ব আছে এবং আমার উপর স্ত্রীর যে অধিকার আছে তা আমি যথাযথভাবে আদায় করবো। তাহলেই স্ত্রীর হক আদায় হয়ে গেল। তদ্রুপ স্ত্রীর অন্তরে যদি এ কথা জাগ্রত হয়, আমার স্বামীর প্রতি যে দায়িত্ব আছে এবং স্বামীর যে হক্ব আমার উপর আছে, তা আমি সুচারুরূপে আদায় করবো। তাহলে স্বামীর হক্ব আদায় হয়ে যাবে। শ্রমিকের অন্তরে যদি এ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় যে, মালিকের প্রতি আমার যে দায়িত্ব আছে এবং আমার উপর মালিকের যে হক্ব আছে আমি তা সুষ্ঠুভাবে আদায় করবো। তাহলে মালিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। তদ্রুপ মালিকের অন্তরে যদি এ চিন্তা জাগ্রত হয় যে, আমার জিম্মায় শ্রমিকের যে হক্ব আছে,

আমি তা যথাযথ ভাবে আদায় করবো। তাহলে শ্রমিকের অধিকার আদায় হয়ে যাবে। মোটকথা যে সময় পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে এ দায়িত্ব সচেতনতা জাগ্রত না হবে, সে সময় পর্যন্ত শুধু অধিকার আদায়ের শ্লোগানই শোনা যাবে এবং অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন সংগঠনই কায়িম হবে। মিটিং মিছিল ইত্যাদি হবে। কিন্তু কারো অধিকার আদায় হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত না হবে যে, আল্লাহ্ পাকের সামনে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে, আমাকে এ সকল হক (অধিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার একটি মাত্র রাস্তা যে নিজে দায়িত্ব সচেতন হয়ে, নিজ দায়িত্ব ও অন্যের হক্ব যথাযথরূপে আদায় করা।

এটাও মাপে কম দেওয়ার মধ্যে শামিল

আমাদের চাকুরীর সময়টা আমাদের নিকট আমানত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ

أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

অর্থাৎ ঃ মর্মন্তদ শাস্তি ঐ সকল লোকদের জন্য যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়। আর যখন অন্য কারো থেকে নেওয়ার সময় আসে, তখন পরিপূর্ণ করে নেয়। যেন সামান্যও কম না হয়। কিন্তু যখন অন্যকে দেওয়ার সময় আসে, তখন কম দেয়, ধোঁকাবাজি করে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে এদের জন্য মারাত্মক শাস্তি রয়েছে।

এখন মানুষেরা মনে করে মাপ বা ওজনে কম দেয়া ঐ সময়ই

হবে যখন কোন কিছু বিক্রি করে, আর এতে ওজনে কম দেয় বা ওজনের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। অথচ উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ

التطفيف في كلّ شئ۔

অর্থাৎ ঃ ওজনে বা মাপে কম দেয়াটা সব জিনিষের মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি আট ঘন্টার জন্য চাকুরী নেয়। আর সে পূর্ণ আট ঘন্টা ডিউটি না করে। তাহলে সেও মাপে (ওজনে) কম করছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহের আলোকে সেও গোনাহ্গার হবে। অতএব এ সকল ব্যাপারে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

পদ একটি দায়িত্বের ফাঁদ

আজকাল আমাদের উপর যে মসিবত চেপে বসেছে যে, যদি কারো কোন সরকারী অফিসে কোন কাজের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার উপর কিয়ামত এসে যায়। সহজে কাজ উদ্ধার হয় না। বার বার অফিসের চক্কর কাটতে হয়। কোন সময় হয়তো অফিসার সাহেব নিজ আসনে থাকেন না। কোন সময় হয়তো বলা হয় যে আজ কাজ হবে না। পরের দিন গেলে বলা হয় আগামী কাল এসো। বার বার চক্কর লাগানো সত্ত্বেও কাজ হয় না। এর অন্যতম কারণ হলো আমাদের দায়িত্ব সচেতনতা ও আমানতের উপলব্ধি শেষ হয়ে গেছে। কেউ যদি কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তার জন্য এটাকে স্বীয় ফায়দা লুটার উপকরণ বা ফুলের তোড়া মনে করা উচিত নয়। বরং একে দায়িত্বের একটি ফাঁদ মনে করা উচিত। রাষ্ট্র ক্ষমতা, প্রশাসন, বিভিন্ন পদ, এগুলো একেকটি দায়িত্বের ফাঁদ। এটা এমন কঠিন দায়িত্ব যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) বলেন ঃ যদি সুদূর ফোরাতের তীরেও কোন কুকুর ক্ষুধা বা পিপাসায় মারা যায়, তাহলেও আমার ভয় হয়, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক আমাকে এজন্য প্রশ্ন করে না বসেন? যে হে ওমর! তোমার খিলাফতের সময় অমুক কুকুর ক্ষুধা-পিপাসায় মারা গেছে।

এমন লোককে খলিফা বানানো যাবে না

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত ওমর (রাযিঃ) আততায়ীর আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। তখন কতিপয় সাহাবী তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলো ঃ হযরত আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কাজেই আপনি আপনার পরবর্তী স্থলাভিষিক্তের নাম প্রস্তাব করে যান। যেন আপনার মৃত্যুর পর সে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ সকল সাহাবায়ে কিরামের কেউ কেউ এ কথাও বললো, যে আপনি আপনার খলিফা হিসেবে আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ্র নাম প্রস্তাব করে যান। যেন সে আপনার পরে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন ঃ না, এটা হতে পারে না, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ম জানেনা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছো তাকে খলিফা নিয়োগ করার জন্য। (তারীখুল খোলাফা-আল্লামা সূয়ূতী (রহঃ) কৃত ১১৩ পৃঃ)

আসল ঘটনা হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) স্বীয় স্ত্রীকে হায়েয (ঋতুমতি) অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলেন। আর নিয়ম হলো ঃ যখন মহিলাগণ হায়েয (ঋতুমতি) অবস্থায় থাকে, তখন তাকে তালাক দেওয়া জায়িয নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) এ মাসয়ালা জানতেন না। কাজেই এ ঘটনা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, তখন বললেন ঃ তুমি এটা ভুল করেছো। কাজেই রুজু করো। (তালাক ফিরিয়ে নাও) তার পরও যদি তালাক দিতে হয়, তাহলে হায়েয অবস্থায় নয়, পবিত্রা অবস্থায় দিও।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এ ঘটনার দিকে ইশারা করেই বলেছেন ঃ তোমরা এমন লোককে খালিফা বানাতে চাও, যে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতেও জানেনা। (তারীখুল খোলাফাহ ১১৩ পৃঃ)

হযরত ওমরের দায়িত্ব সচেতনতা

এরপর হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আসল কথা হলো, খিলাফতের এ গুরু দায়িত্বের ফাঁদ খাত্তাবের বংশধরদের একজনের

কাঁদে পড়েছে, এ যথেষ্ট। হযরত ওমর এ কথার দ্বারা নিজেকে বুঝিয়েছেন যে, বার বৎসর পর্যন্ত এ ফাঁদ আমার গলায় আটকে আছে, এ যথেষ্ট। এখন এ বংশের অন্য কারো গলায় আমি এ ফাঁদ পড়াতে চাই না। কারণ হলো, আমি কিছুই জানিনা যদি আল্লাহ্ পাকের নিকট আমাকে এ দায়িত্বের হিসাব দিতে হয়, তাহলে সে সময় আমার অবস্থা কেমন হবে।

হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) সে ব্যক্তি যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকে শুনেছেন ঃ عمر في الجنة

অর্থাৎ ঃ ওমর বেহেশ্তে যাবে। এ সুসংবাদের পর বেহেশ্তে যাওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রাযিঃ) এর আল্লাহ্ পাকের নিকট হিসাব কিতাব ও দায়িত্বের এমন ভয় ও অনুভূতি ছিলো। (তারিখে তাবরী ৩ঃ২৯২)

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি আমি আমার এ দায়িত্বে হিসাবে বরাবর হয়ে যাই, যে আমার উপর কোন গোনাহ্ও নেই, কোন ছওয়াবও নেই। আর এর ফলে আমাকে আ'রাফে রাখা হয়। (আ'রাফ বলা হয় বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝামাঝি জায়গাকে। যেখানে ঐ সকল লোকদেরকে রাখা হবে, যাদের গোনাহ্ ও ছওয়াব বরাবর হয়।) তাহলে এটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে, যে আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম। আসল কথা হলো, এ আমানতের যথাযথ অনুভূতি যা আল্লাহ্ পাক হযরত ওমর (রাযিঃ) কে দান করেছিলেন এর সামান্যও যদি আমাদের অন্তরে থাকতো, তাহলে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আমাদের এক নম্বর সমস্যা খিয়ানত

কোন এক সময় এ আলোচনা সাধারণের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করেছিলো যে, আমাদের এক নম্বর সমস্যা কি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সংকট কি? অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্যার সঠিক ধারণা আমাদের

মাথায় নেই। নিজ দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নিকট জওয়াবদিহিতার চিন্তা নেই। আমাদের জীবন দ্রুত চলে যাচ্ছে। এ জীবনে আমরা পয়সা উপার্জন, বিভিন্ন প্রকারের মুখেরোচক খাবার ও ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে ছুটছি। অথচ আল্লাহ্ পাকের আদালতে হাযির হওয়ার চিন্তা আমাদের আদৌ নেই। আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং সর্বরোগের মূল এটাই, যে আমাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় ও আজমত নেই। আল্লাহ্ পাক যদি অনুগ্রহ করে আমাদের অন্তরে পরকালে তাঁর সামনে দাড়িয়ে জওয়াদিহিতার ভয় পয়দা করে দেন, তাহলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অফিসের জিনিষ আমানত

যে অফিসে আপনি চাকুরী করেন, এ অফিসের সকল আসবাবপত্র আপনার নিকট আমানত। এ সকল জিনিষ আপনাকে অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ সকল আসবাবপত্র আপনার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে তা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। লোকেরা মনে করে যদি অফিসের সামান্য জিনিষ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করি, এতে তেমন ক্ষতি নেই। এদের মনে রাখা দরকার খিয়ানত চাই বড় জিনিষে হোক কিংবা ছোট জিনিষে উভয়ই হারাম এবং কবীরা গোনাহ্। উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী হচ্ছে। কাজেই উভয় থেকেই বেঁচে থাকতে হবে।

সরকারী জিনিষও আমানত

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমানতের প্রকৃত অর্থ হলো, আপনার উপর ভরসা করে কেউ কোন কাজ বা জিনিষের জিম্মাদারী আপনাকে অর্পন করলো। অতপর আপনি তার আস্থা ও ভরসা অনুযায়ী সে কাজ সম্পন্ন করলেন না। তাহলে এটা খিয়ানত হবে। যে সকল সরকারী রাস্তায়

আমরা চলি, যে সকল বাস বা ট্রেনে আমরা সফর করি, এ সবই আমাদের নিকট আমানত। অর্থাৎ এগুলোকে যদি যথাযথ নিয়মে জায়িযভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আমাদের জন্য বৈধ হবে। আর যদি এগুলোকে নিয়ম বর্হিভূত নাজায়িযভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হবে। যা একান্তই হারাম। যেমন এগুলো ব্যবহার করার সময় এতে ময়লা ফেলা হলো, কিংবা এর কোন প্রকার ক্ষতি করা হলো। আজ কাল তো লোকেরা সরকারী রাস্তাকে নিজস্ব জিনিষ মনে করে থাকে। কেউ রাস্তা খনন করে নিজের বাড়ির ময়লা পানি বের হওয়ার ড্রেন বানিয়ে নেয়। কেউ রাস্তা বন্ধ করে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অনুষ্ঠান করে। অথচ ফিকাহ্‌র কিতাবে উলামায়ে কিরাম মাসয়ালা লিখেছেন, যদি কেউ নিজ বাড়ির ছাদের পানি নিষ্কাশনের পাইপের (পরনালার) মাথা বাহিরের রাস্তায় লাগায়, তাহলে সে যেহেতু এমন জায়গা ব্যবহার করছে যা তার মালিকানায় নয়, কাজেই তার জন্য এরূপ কাজ করা জায়িয নয়। চিন্তার বিষয় হলো এতে তেমন জায়গাও আটকায় না, তা সত্ত্বেও একে নাজায়িয বলা হয়েছে। কারণ এ জায়গা আমানত, নিজের মালিকানা নয়।

হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) এর পরনালা

হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন। তাঁর "পরনালা" সংক্রান্ত একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তাঁর বাড়ি মসজিদে নববীর সাথে লাগানো ছিলো। ঐ বাড়ির একটি "পরনালার" মাথা মসজিদের নববীর আঙ্গিনায় পড়তো। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর দৃষ্টি ঐ পরনালার উপর পড়লো। তিনি দেখলেন ঐ পরনালা মসজিদের অংশে পড়েছে।

লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কার পরনালা। লোকেরা বললো ঃ হযরত আব্বাছ (রাযিঃ)-এর। তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দিলেন। কারণ মসজিদের দিকে পরনালা বের করা জায়িয নয়। এ ঘটনা হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি

হযরত ওমরের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন ঃ এটা আপনি কি করলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন। এ পরনালা যেহেতু মসজিদে নববীর অংশে লাগানো ছিলো, তাই তা ফেলে দিয়েছি। হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) বললেন ঃ এ পরনালা আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে লাগিয়েছি। হযরত ওমর যখন শুনলেন, যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে লাগানো হয়েছে। তখন হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) কে বললেন ঃ আপনি আমার সাথে চলুন। উভয়ে যখন মসজিদে নববীতে পৌছলেন। তখন ওমর (রাযিঃ) রুকুর মত ঝুকে গেলেন এবং হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) কে বললেন হে আব্বাছ ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে এ পরনালা পুনরায় লাগিয়ে নিন। কারণ হলো, খাত্তাবের পুত্রের এ সাহস নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে লাগানো পরনালা ভেঙ্গে দেয়। হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) বললেন ঃ থাক আমি লাগিয়ে নিবো। কিন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন ঃ না যেহেতু আমি ভেঙ্গেছি, কাজেই এর শাস্তিও আমিই ভোগ করবো। শরীয়তের আসল মাসয়ালাতো এটাই ছিলো যে, প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া পরনালা লাগানো জায়িয ছিলো না। কিন্তু যেহেতু হযরত আব্বাছ (রাযিঃ) কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন, কাজেই তার জন্য জায়িয ছিলো।

(তাবকাতে ইবনে সায়াদ ৪ ঃ ২০)

আজ আমাদের অবস্থা হলো, যার যতটুকু ইচ্ছে সরকারী রাস্তা-জমি দখল করে নিচ্ছি। একবারও আমাদের মনে হচ্ছে না, যে আমরা কোন গোনাহের কাজ করছি। নামাযও আদায় করছি, সাথে সাথে এ খিয়ানতও করছি। উপরোক্ত সব কিছুই আমানতের মধ্যে খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই এসব কিছু থেকে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মজলিসের কথাবার্তা আমানত

এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

المجَالسُ بالامانة

অর্থাৎ ঃ মজলিসে যে কথা বলা হয় তা শ্রোতাদের নিকট আমানত স্বরূপ। যেমন, দুই তিনজন মিলে মজলিসে কথাবার্তা হচ্ছিল, আন্তরিক পরিবেশে কেউ তার গোপন কথা বলে ফেললো। এক্ষেত্রে ঐ সকল কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত অন্যের নিকট পৌছানো আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা বলে গণ্য হবে। যা একান্তই হারাম। অনেকেরই এ বদ অভ্যাস আছে যে, এদিকের কথা ওদিকে, আর ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে বেড়ায়। আর সকল ফিতনা ফ্যাসাদ এভাবেই ছড়ায়। অবশ্য যদি মজলিসে এমন কোন কথা আলোচনা হয়, যাতে অন্যের ক্ষতির আশংকা থাকে। যেমন দুই-তিন ব্যক্তি মিলে এ পরিকল্পনা করলো, যে অমুক সময় অমুকের বাড়িতে আক্রমণ করবো। এটা জানা কথা, যে এ অবস্থায় এ কথা গোপন রাখা যাবে না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দিতে হবে, যে তোমার বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু যেখানে এমন কোন পরিস্থিতি না হয়, সেখানে অন্যের গোপন কথা প্রকাশ করা জায়িয় নয়।

গোপন কথা একটি আমানত

অনেক সময় মজলিসের গোপন আলোচনা একজনে শুনে অন্যকে এভাবে বলে থাকে; ভাই এটা গোপন কথা তোমাকে বলছি, তুমি কিন্তু অন্য কাউকে বলো না। এ ব্যক্তি মনে করে আমি তো তাকে অন্যের নিকট বলতে নিষেধ করে দিয়েছি, কাজেই একথা আর অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। অথচ এ শ্রোতাও তৃতীয় আরেকজনকে এভাবেই বলে দেয় যে, দেখো ভাই! আমি তোমাকে গোপন কথা বলছি, তুমি অন্য কাউকে বলো না। এভাবে একথা তৃতীয় ব্যক্তি হতে ৪র্থ ব্যক্তি, ৪র্থ ব্যক্তি হতে ৫ম ব্যক্তি, অতঃপর গোপন কথা আর

গোপন থাকে না। অথচ সকলেই মনে করে আমরা এভাবে আমানত রক্ষা করছি। আমাদের লক্ষ্য করা দরকার যে, যখন এটা গোপন কথা ছিলো, তখন তা আমাদের নিকট আমানত ছিলো। কাজেই একথা অন্যকে বলার অর্থই হলো আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা। চাই তা অন্যকে বলতে নিষেধ করে দিয়ে বলি, বা এমনিই বলি। এরূপ কথা অন্যকে বলাটাই খিয়ানত, যা একান্ত নাজায়িয।

এটা এমন এক মারাত্মক ব্যাপার যা আমাদের সমাজে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ লাগিয়ে রেখেছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ এভাবেই ছড়ায় যে, একজন আরেকজনকে বলে; আরে ভাই! সে তো তোমার সম্পর্কে এমন এমন বলেছে। একথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই তার অন্তরে ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এ ধরনের কথা লাগাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

ফোনে অন্যের কথা শোনা খিয়ানত

দু'ব্যক্তি আপনার নিকট হতে পৃথক হয়ে কানে কানে কথা বলছে। এ অবস্থায় আপনি তাদের পিছে গিয়ে কান লাগিয়ে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। এটাও আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত।

অথবা টেলিফোন করার সময় ক্রস কানেক্শন হয়ে, আপনার ফোনের সাথে অন্য কারো লাইন মিলে গেল। এ অবস্থায় আপনি তার কথা শুনতে আরম্ভ করলেন। এটাও আমানতের মধ্যে খিয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। অন্যের দোষ খোঁজার শামিল। যা নাজায়িয। অথচ আজকাল আমরা একথা বলে গর্ব করে থাকি যে, অমুকের গোপন কথা আমি জেনে ফেলেছি। এটাকে বড় কৌশল, বড় পারদর্শিতা মনে করা হয়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এটা খিয়ানত, যা একান্তই না জায়িয।

মোটকথা আমানতের পরিধি এত বিস্তৃত যে জীবনের কোন অধ্যায় এমন নেই, যেখানে আমাদেরকে আমানত রক্ষা করার এবং খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকার হুকুম দেয়া হয়নি। উপরে যা কিছু বলা হলো, সবই আমানতের পরিপন্থি এবং মুনাফিকের নিদর্শন। কাজেই এ হাদীস আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, তিনটি জিনিষ মুনাফিকের আলামত (চিহ্ন) (১) মিথ্যা কথা বলা; (২) ওয়াদা ভঙ্গ করা; (৩) আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। এসবই ধর্মের অংশ। আমরা ধর্মকে একেবারে সংকীর্ণ করে ফেলেছি এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তা ভূলে বসে আছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের অন্তরে এ ব্যাপারে ফিক্‌র পয়দা করে দিন। আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে চালান। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ